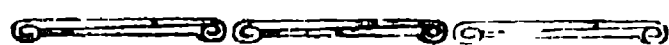
কাব্য-পরিমিতি

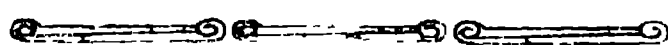
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মূল্য এক টাকা

১ সি, লেক রোড, কালীঘাট
রসচক্র সাহিত্য-সংসদ হইতে
শ্রীরাধেশ রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৩৮



উপাসনা প্রেস, ২, ওয়েলিংটন লেন, ধর্ম্মতলা,
কলিকাতা হইতে
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বন্ধুবর সুকবি

শ্রীকালিদাস রায়কে

অর্পিত হইল।

কাব্য-পরিমিতি ১৩৩৭ ও ১৩৩৮ সালে "উপাসনা" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইল।

কাব্য-পরিমিতি

সূত্র

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংসার-রূপ বৃক্ষে দুইটী মাত্র অমৃত-ফলের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—একটী কাব্যরস, অপরটী সাধুসঙ্গ। জীবনে আমরা নানা ফলেব আস্বাদ গ্রহণ কবি সত্য, কিন্তু তাহার কোনটীকেই জোর করিয়া অমৃত-ফল বলা যায় না। সাধুসঙ্গ এ যুগে একান্ত দুর্ল্লভ। এখন যাঁহারা অমৃত-ফলের আস্বাদ লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের কাব্যরসই একমাত্র ভরসা।

কিন্তু দেখা যায় এই কাব্যরস-রূপ অমৃতফলের আস্বাদন-প্রয়াসীদের মধ্যে নানা মতভেদ, বৈষম্য, এমন কি—বিসম্বাদ। এই মতভেদের কাব্যাতিরিক্ত ব্যক্তিগত কারণগুলি ছাড়িয়া দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পরিমাণ অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে রস আস্বাদন অনেকেই করিয়াছেন, তাহার পথও অনেকের পরিচিত। তৎসত্ত্বেও এত মতভেদ দেখিয়া, এই বিচিত্র কাব্যরসের উৎস, ধারা ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিবার বাসনা মনে জাগিয়া উঠে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে রসের স্থান অতি উচ্চে,—তাহা না-কি ব্রহ্মাস্বাদ-সোদর। কিন্তু এ রস থাকে কোথায়? কবিচিত্তে, না কাব্যে, না পাঠকচিত্তে; অথবা কাব্যের ভিতর দিয়া কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার যে মিলন তাহারই নাম রস? কোন্ কাব্যে কি পরিমাণে রস আছে তাহার শেষ মীমাংসা যে আজও হইল না, তাহার কারণ কি এই নয় যে—এ প্রশ্নের মূলে ভুল আছে? কাব্য ও রস হয়ত আধার আধেয় সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

এ সমস্ত প্রশ্নের সমুচিত মীমাংসা করিয়া রসের স্বরূপ বোঝান ঠিক সম্ভবপর মনে হয় না। কারণ রস অনুভূতির বিষয়। কাব্য বুঝা যায় ও অনেকাংশে বুঝান যায়, কিন্তু রস অনুভব করিতে হয়। রস কেন বুঝা যায় না, এই আলোচনাই বোধ হয় রসের আলোচনা।

কাব্য কি বস্তু এবং রস কেন বুঝা যায় না, ইহার আলোচনা করিতে গিয়া দেখা যায়, যে এই ব্যাপারে দুইটী পৃথক ধারা কাজ করিতেছে।

প্রথমটী—কবিচিত্তধারা, যাহা কাব্য সৃষ্টি করে।

অপরটী—পাঠকচিত্তধারা, যাহা কাব্য উপভোগ করে। এই দুইটী ধারার পথে রসের হ্রদ কোথায়? কোন্ গহনের অন্তরালে তাহা আপনার অপার বিস্তৃতি ও অগাধ গভীরতা লইয়া বিরাজ করিতেছে? এ সন্ধান কাব্যের ভিতর দিয়াই

করিতে হইবে, কারণ কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের মিলন কাব্যের ভিতর দিয়াই সংঘটিত হয়। কাব্যই পাঠকচিত্তের পক্ষে রসে পৌঁছিবার উপায়, আর কবিচিত্তের পক্ষে রস-স্নানের পর তীরে উঠা। কথাটা বিশদ করিবার জন্য প্রথমে কবিচিত্তধারার অনুসরণ করি।

মানুষ মাটীর উপর দাঁড়াইয়া আছে; তাহার প্রথম ও শেষ পরিচয় এই বস্তু-জগতের সহিত। কাব্যজগতও এই বস্তু-জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবিচিত্তধারা বস্তুজগত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করে, সুতরাং কাব্যের মূল বস্তুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। এই বস্তু-জগৎ কবি, পাঠক, রসিক, অরসিকের সাধারণ বিচরণ-ক্ষেত্র।

কবিচিত্তধারা

বস্তু বা বিষয়ের সহিত মানবমনের ঘাতপ্রতিঘাতে 'ভাব'এর উৎপত্তি। ইংরাজীতে ইহাকে emotion বলা হয়। বাংলায় আমরা emotionকে কখনও চিত্তবৃত্তি, কখনও ভাবাবেগ বলিয়া থাকি। কিন্তু কাব্যবিচারে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যবহৃত 'ভাব' কথাটীই প্রশস্ত। কেবল সাবধানে থাকিতে হইবে, আমরা কোন লেখার ভাব বা ভাবার্থ বলিতে যাহা বুঝি, কাব্যতত্ত্ব-বিচারে 'ভাব' বলিলে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু বুঝিতে হইবে। ভাব-অর্থে আমরা অনেক সময় ideaকেও বুঝি। কিন্তু 'ভাব'

ভাব

বলিতে আমরা এখন বস্তু বা বিষয়-সংঘাতে চিত্তের ভাবাবেগ বুঝিব।

মানবমন একান্ত জটিল ও অপরূপ সৃষ্টি। তাহার কোন্ স্তরে কোন্ বস্তু বা বিষয়ের আঘাত লাগিয়া কোন্ সূক্ষ্ম ভাবের সৃষ্টি হয় তাহা আমাদের দুর্জ্ঞেয়; আর তাহার সম্যক্ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনও উপস্থিত নাই। একথা সকলেই বুঝিতে পারি, মানব-মনের 'ভাব' সংখ্যায় অনেক। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাহাদিগকে প্রধানতঃ নয়টী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। ইহাদিগকে 'স্থায়ী ভাব' বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানা অপ্রধান ভাব স্থায়ী ভাবগুলির সহচর-রূপে মানব-মনে যাতায়াত করে,—তাহাদের 'সঞ্চারী ভাব' বলা হইয়াছে। ভাবকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, তাঁহাদের মতে কতকগুলি ভাব মানবমনের চিরন্তন সম্পত্তি। অতীতে তাহারা ছিল, বর্ত্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আর সঞ্চারী ভাব যুগে যুগে প্রবল দুর্ব্বল হইতে পারে, তাহারা স্থায়ী ভাবের আশ্রয়ে নিজেদের ধারা বজায় রাখিয়া চলে; কখনও বা ভাব-বিশেষ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, আবার যুগধর্ম্মে নূতন সঞ্চারী ভাবেরও অভ্যুদয় হয়। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই মনে রতি, হাস্য ইত্যাদি নয়টী ভাব চিরদিন

ছিল ও থাকিবে। যাহা হউক, সাধারণ মানবচিত্তের ন্যায় কবি-চিত্তও এই সমস্ত 'ভাব'এর অধীন; প্রভেদ এই যে কবি-চিত্তে এই সমস্ত ভাবকে দশজনের উপভোগ্য করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জন্মে; অর্থাৎ কবিচিত্ত ভাবকে রসে পরিণত করিতে চায়। এই ইচ্ছা জন্মে কেন? ইহার সঠিক উত্তর সম্ভব নয়। যাহার প্রেরণায় বা তাগিদে কবিচিত্তে ভাবকে দশজনের উপভোগ্য করিয়া, অর্থাৎ রসে পরিণত করিয়া, প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জন্মে, তাহাকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি। যে অলৌকিক শক্তি সাধারণ মানবচিত্তধারা হইতে কবিচিত্তকে পৃথক করিয়া, ভাব হইতে তাহাকে রসে উঠিবার জন্য নিরন্তর উত্তেজিত করে, তাহাই কবিপ্রতিভা। যে অচিন্ত্য শক্তিবলে ধরিত্রী তাহার সাধারণ মৃৎরসকে গোলাপে, চম্পকে, বকুলে গন্ধায়িত করিয়া তুলিতেছে, সেই শক্তি বোধ হয় মানবচিত্তে ভিন্নরূপে সক্রিয় হইয়া ভাবকে রসে রূপান্তরিত করিবার ইচ্ছা জন্মায়। অর্থলোভে ও যশোলোভে কাব্যনির্ম্মাণের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বস্তু, সে কথা এখানে বলিতেছি না।

প্রতিভা

বলিয়াছি, ভাবকে উপভোগ্য করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা কবিচিত্তের বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু ভাষায় 'ভাব'-এর প্রকাশমাত্রই কাব্য নহে। ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন ক্রোধভাবের প্রকাশ হইলেও ইহা ভাবের

লৌকিক প্রকাশ মাত্র। কবিচিত্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, কারণ ক্রোধকে উপভোগ্য করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ক্রুদ্ধ মনিবের চিত্তে কখনও জাগে না। ক্রন্দনে প্রিয়বিয়োগের যে প্রকাশ, তাহা শোকের লৌকিক প্রকাশ। কবিচিত্তধারা সে পথে চলে না। সে ভাবকে উপভোগ্য করিয়া তবে প্রকাশ করিতে চাহে।

এই সব লৌকিক ভাবকে কবি কি উপায়ে উপভোগ্য করেন? কোন্ মন্ত্রে এমন অসম্ভব সম্ভব হয় যে রামসীতা-বিরহের অসহ দুঃখ হইতে আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি; অপরের শোক হইতে আনন্দ পাইবার অভিলাষে রঙ্গালয়ে ছুটিয়া যাই? কবিচিত্ত যে উপায়ে এই অসাধ্যসাধন করে তাহাকে আমরা 'কল্পনা' বলি। কবিমানসে কল্পনা নামে যে মায়াবিনী বাস করে, সেই এই মায়া-রাজ্যের সৃষ্টি করে—যেখানে পুত্রশোক ও প্রিয়া-মিলন উভয়ই উপভোগ্য হইয়া উঠে।

কল্পনা

কিন্তু ভাব অর্থাৎ emotionএর উদ্রেক মাত্র কি কবি কল্পনালোকে উপনীত হন? পুত্রশোক হইবামাত্র কেহ কবিতা লিখিবার উদ্দেশ্যে কল্পনার আশ্রয় লইতেছেন, ইহা শোনা যায় না। বস্তু-সংঘাতে চিত্তে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহার পরও সেই সেই ভাবের স্মৃতি মানব-মনে জমা

হইয়া থাকে। কবি সেই ভাবস্মৃতি হইতেই তাঁহার কল্পনার খোরাক গ্রহণ করেন। ভাব-লোকের পর ভাবস্মৃতির জগৎ আছে—তাহাকে পণ্ডিতেরা 'বাসনা' বলিয়াছেন। রতিভাব হইতে মনে 'রতি-বাসনা,' ক্রোধভাব হইতে 'ক্রোধ-বাসনা' শোকভাব হইতে 'শোক-বাসনা' ইত্যাদি সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সব 'বাসনা' 'ভাব'এর ন্যায়ই লৌকিক। মানব-চিত্তে শোক যেমন দুঃখপ্রদ, শোকের স্মৃতি বা বাসনাও প্রায় সেইরূপই দুঃখ-প্রদ। কবিচিত্ত বাসনা-লোকেও সাধারণ মানবচিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় নাই। কেবল ভাব বাসনার ক্ষেত্রে উঠিয়া, সাধারণ মানবচিত্ত অপেক্ষা কবিচিত্তে অধিকতর সংহতরূপ ধারণ করে, অর্থাৎ দানা বাঁধিয়া উঠে। কবিচিত্ত ভাব হইতে বাসনান্তরে উঠিবার সময় প্রতিভার দ্বারা পরোক্ষভাবে কথঞ্চিৎ ভাবিত হয় বলিয়াই এই সংহতি সম্ভব হয়। কিন্তু বাসনার ঊর্দ্ধে যে কল্পনা-লোক, সেখানে প্রবেশের অধিকার কবিচিত্তেরই আছে। কল্পনা-লোকে আসিয়াই কবিচিত্ত বিশেষত্ব লাভ করে।

বাসনা

কোন বস্তু বা বিষয়ের আঘাত মাত্র যে 'ভাব'বিশেষ উৎপন্ন হইল সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়াই উত্তম কাব্য লেখা হইয়াছে,—ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে ভাবের নূতন আঘাতে কবিচিত্তে পূর্ব্ব-

সঞ্চিত তজ্জাতীয় 'বাসনা' আলোড়িত হইয়াছে বলিয়াই কল্পনা-সাহায্যে সে কাব্যের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। ভাবলোক ও কল্পনালোকের মধ্যে বাসনা-লোকের অবস্থান কল্পনামাত্র নহে।

'ভাব'এর মধ্য দিয়া আহৃত বস্তু বা বিষয়কে 'বাসনা'য় সঞ্চিত করিয়া, প্রতিভার প্রেরণায় কবিচিত্ত কল্পনালোকে পৌঁছিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু মানবচিত্ত বুঝিতে চায়, কল্পনা-লোকে পৌঁছিয়া কবিচিত্ত কোন্ কৌশলে কাব্য সৃজন করে। কবি-চিত্ত-ধারার অনুসরণে এই মায়ার জগতে পৌঁছিয়া বুদ্ধি যদিও কতকটা দিশাহারা হয়, তথাপি সে এখনও একেবারে অভিভূত হয় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবলে সে ধরিতে পারে, যে এ রাজ্যে কবিচিত্তের প্রধান সম্বল তিনটী ;—বিভাব, অনুভাব ও উপভাব।

বিভাব অনুভাব উপভাব

কবিচিত্ত কল্পনালোকে বসিয়া এই বিভাব, অনুভাব ও উপভাবের সাহায্যে ভাবস্মৃতি বা বাসনাকে উপভোগ্য, অর্থাৎ রসে রূপান্তরিত করিবার প্রয়াস পায়। রতি বা অনুরাগ-বাসনা রূপান্তরিত হইয়া শৃঙ্গার অর্থাৎ মধুর রসে, হাস্য-বাসনা হাস্য রসে, শোক-বাসনা করুণ রসে, ক্রোধ-বাসনা রৌদ্র রসে, উৎসাহ-বাসনা বীর রসে, জুগুপ্সা-বাসনা বীভৎস রসে, বিস্ময়-বাসনা অদ্ভুত রসে ও শম-বাসনা শান্ত রসে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রকাশ

তখনও কবিচিত্তে আবদ্ধ, শব্দ তখনও শ্রেণীবদ্ধ হয় নাই, অলঙ্কার তখনও ঝঙ্কার তুলে নাই, অর্থ তখনও বাক্যকে ছাড়াইয়া যায় নাই। কল্পনালোকস্থ বিভাব, অনুভাব ও উপভাবের ইন্ধনে 'বাসনা' তখন পাক হইয়া কবিচিত্তে রস উৎপাদন করিতেছে।

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোণা
প্রতিদিন আমি কোরেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব।—

ইহা অনেকটা কবিচিত্তের আত্মপ্রকাশ।

বিভাব, অনুভাব, উপভাব কি? বিশেষ বিশেষ ভাবের উৎপত্তির বিশেষ বিশেষ কারণ থাকে,—যেমন সুন্দরীর সংস্পর্শ রতিভাবের কারণ। বাসনাপুষ্ট কবিচিত্তে সেই কারণের প্রকাশ-কল্পনার নাম ঐ ভাবের বিভাব। প্রিয়-বিয়োগ শোকভাবের কারণ, কিন্তু তাহা শোকভাবের বিভাব নহে। শোক-বাসনাপুষ্ট কবিচিত্ত শোকভাবের কারণস্বরূপ প্রিয়বিয়োগের প্রকাশ বা বর্ণনা যে রূপে কল্পিত করে, তাহাই শোকভাবের বিভাব। কবিপ্রতিভার তার-তম্যানুযায়ী বিভাব উত্তম অধম হয়।

চিত্তে কোন ভাব উৎপন্ন হওয়ার পর দৈহিক কার্য্যে বা বহির্লক্ষণে তাহা প্রকাশ পায়,—যেমন শোকভাব ক্রন্দনে।

কবিচিত্তে সেই সেই কার্য্য বা লক্ষণের প্রকাশ-কল্পনাকে 'অনুভাব' বলা যায়। ক্রন্দন শোকভাবের বহির্লক্ষণ মাত্র, —অনুভাব নহে। কবিচিত্তে সেই ক্রন্দন-প্রকাশের বিশিষ্ট কল্পনাকে শোকভাবের 'অনুভাব' বলা হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রধান ভাবগুলি ছাড়াও অনেক গৌণ ভাব মানব-মনে যাতায়াত করে—যাহাদিগকে 'সঞ্চারী' ভাব বলা হয়। এই সমস্ত সঞ্চারী ভাব প্রধান ভাবকে পুষ্ট করে। রাজার চিত্তে রাজ্যনাশজনিত শোকভাবের সহিত রাজজনোচিত গর্ব্বভাবও মিশ্রিত থাকে। রাজার শোক-ভাব এই সঞ্চারী গর্ব্ব-ভাবের দ্বারা পুষ্ট হইয়া বিশেষত্ব লাভ করে। কবিচিত্তে প্রধান ভাবকে পুষ্ট করিবার জন্য এই সঞ্চারী-ভাবের প্রকাশের কল্পনাকে ঐ প্রধান ভাবের 'উপভাব' বলি।

'কাঙালিনী' কবিতায় কবিকল্পনা একটী বিশেষ শোক-ভাবকে করুণ রসে পরিণত করিয়াছে। এই কাব্যের কল্পনাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, কবিচিত্ত প্রথমে বিভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,

ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন।
কত কে যে আসে কত যায়,
কেহ হাসে কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা
ঝলকিছে কাঞ্চন রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা ছবির মতন।

উৎসবমুখরিত ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ের মনে শোকভাব জাগিবার কারণগুলির এই যে বিশেষ কল্পনা,—ইহাই এ কবিতায় শোকভাবের বিভাব।

শোকের কারণ কল্পিত হইবার পর, শোকভাবের কার্য্যে বা বহির্লক্ষণে কল্পনার লীলা আরম্ভ হইল।

তাই বুঝি আঁখি ছল ছল
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে—মাগো এ কেমন ধারা!
এত বাঁশী, এত হাসি-রাশি,
এত তোর রতন ভূষণ,

তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন ?
* * * *
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিযে
আমি ত ওদের কেহ নই !

ছল ছল নয়নে, দীর্ঘ নিশ্বাসে, কাঙালিনী মেয়ের শোক-ভাবাবিষ্ট মনের বহিঃপ্রকাশের এই যে কল্পনা, ইহাই এ কাব্যে শোক-ভাবের 'অনুভাব'।

কাঙালিনী মেয়ের মনের 'শোক'বিশেষ এ কবিতার ভাব। তাহার মন দুঃখ-কাতর। কিন্তু আবার দেখিতে পাই—

বালিকা কাতর অভিমানে
বলে- "মাগো এ কেমন ধারা ?
এত বাঁশী এত হাসি-রাশি
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী
মোর কেন মলিন বসন ?

এই যে অভিমানরূপ সঞ্চারীভাবের প্রকাশ-কল্পনা, ইহাই এ কবিতার 'উপভাব'। এ কবিতার প্রধান ভাব, শোক-ভাব, অভিমানজনিত উপভাব দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া রসকে

বিশেষত্ব দিতেছে। এ সঞ্চারী ভাবটী বাদ দিলে কবিতা বৈশিষ্ট্যহীন হইত।

আর একটী উদাহরণ দ্বারা বিভাব, অনুভাব ও উপভাব-সাহায্যে রসে রূপান্তর বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কালি, মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
কুঞ্জ-কাননে সুখে,
ফেনিলোচ্ছ্বল যৌবন-সুরা
ধোরেছি তোমার মুখে।

মধুযামিনী, জ্যোৎস্না নিশীথ, ফেনিলোচ্ছ্বল, যৌবন-সুরা —এই সব রতিভাবোদ্বোধক বাক্য বা বিষয়ের কল্পনা কবি-চিত্তের 'রতিবাসনা'কে মধুর রসে পরিণত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইহাই এখানে রতিভাবের 'বিভাব'।

তব অবগুণ্ঠন খানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি,
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন,
মুখে নাহি ছিল বাণী।

এই সব রতিভাব-লক্ষণের কল্পনা কবিচিত্তের 'রতি বাসনা'কে মধুর রসে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে; এগুলি এখানে রতিভাবের 'অনুভাব'।

তব আনমিত মুখ খানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ স'য়েছিলে সখী
হাসি-মুকুলিত মুখে।—

ইহার মধ্যে রতিভাবের 'সঞ্চারী'রূপে যে উভয় মনের হর্ষ ও লজ্জা-ভাব প্রধান রতিভাবকে মধুরতর করিতেছে, কবিচিত্তে ইহাদের প্রকাশ-কল্পনাই 'উপভাব'। এখানে উদ্দিষ্ট মধুররসের উপযোগী পরিবেষ্টনী (atmosphere) রচনা করিবার জন্য কবিকল্পনা 'বিভাবের' আশ্রয় লইয়াছে ; 'অনুভাব' দ্বারা রস ঘন হইয়াছে এবং 'উপভাব' রসকে রঞ্জিত করিতেছে। যে রতিভাব ব্যক্তির চিত্তে পশুভাব মাত্র, মাত্র ভাবরূপে যাহার প্রকাশ সমাজচিত্তে একান্ত লজ্জাজনক, যে 'ভাবে'র সঞ্চিত স্মৃতি অর্থাৎ 'বাসনা' অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবমনকে অধোগামী করে, কল্পনার মায়া-

রস

লোকে তাহাই রূপান্তরিত হইয়া 'শৃঙ্গার' বা 'মধুর' রসে পরিণত হইতেছে। ইহা যে রতি-ভাব বা রতি-বাসনা নহে, পরন্তু মধুর রস, তাহার প্রমাণ এই কাব্য হইতেই দেওয়া যাইতে পারে। কবি-কল্পনা রতি-ভাব ও রতি-বাসনাকে রসলোক বা আনন্দলোকে উঠাইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই সে পরমুহূর্তে পুনরায় কবি-চিত্তকে আনন্দ হইতে আনন্দান্তরে, রস হইতে রসান্তরে চালিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। কবিকল্পনা এখানে কি বিচিত্র পথে কবি-চিত্তকে লইয়া চলিয়াছে !

আজি, নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে,

স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে ল'য়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশীতে উঠেছে বাজি,
এই নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী-তীরে আজি।

ইহার প্রত্যেক কথাটীর কল্পনা শান্তভাবের উদ্বোধক বা বিভাবরূপে শমভাবকে শান্তরসে উঠিবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছে। কাব্যের পূর্ব্বার্দ্ধে কবিচিত্ত যদি রতিভাব-লোক বা রতিবাসনালোকে নিবদ্ধ থাকিত, অর্থাৎ সে যদি আপনার মধ্যে ঐ ভাবকে কল্পনাকৌশলে 'রসে' রূপান্তরিত করিয়া প্রকৃত আনন্দরূপ দিতে না পারিত, উত্তরঙ্গ ভাব ও বাসনা-জলধির বিক্ষোভ মিটাইয়া তাহাকে শান্ত স্বচ্ছ রসসাগরে পরিণত করিতে সক্ষম না হইত, তবে সে চিত্তে সম্পূর্ণ বিরোধী অপর একটী ভাবের, অর্থাৎ শমভাবের, পরিকল্পনা উদিত হইতে পারিত না, কিম্বা উদিত হইলেও তাহা একেবারে বেসুর বলিত।

বস্তু এক,—সুন্দরী নারী; সে অবস্থাবিশেষে মানব-মনকে ভাব হইতে ভাবান্তরে টানিয়া লইয়া যায়; আর ভাবসমূহের বাসনাপুষ্ট কবিচিত্ত যথোচিত বিভাব-অনুভাব-

উপভাব-সমৃদ্ধ অপরূপ কল্পনার সাহায্যে তাহাকে অরূপ রসে পরিণত করিতেছে।

কবিচিত্তধারা এখন রসলোকে বিচরণ করিতেছে। অর্থাৎ প্রতিভা যদি উত্তম শ্রেণীর হয়, তবে কবিচিত্ত এখনও রসলোকে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতেছে—কাব্য এখনও লেখা হয় নাই। পণ্ডিতেরা বলেন—রস ইহা নয়, উহা নয়, কেবল নিজের সম্বিতের আনন্দময় চর্ব্বণ-ব্যাপার, নিজের সত্তার একটী বিশেষ আনন্দময় আস্বাদন। এখান হইতে আমাদের ফিরিয়া আসাই সঙ্গত। কারণ ব্যাপারটা প্রায় অলৌকিক। কবি এখনও কাব্য লেখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি নিজের সত্তার ইক্ষুদণ্ডকে চর্ব্বণ করিতেছেন, যাহার আস্বাদনই রস।

আমি বলিয়াছি প্রতিভা উত্তম শ্রেণীর হইলে, অর্থাৎ তাহা উৎকৃষ্ট কাব্যের জননী হইলে, কবিচিত্ত রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কাব্য এখনও লেখা হয় নাই। কল্পনা-সাহায্যে রসাস্বাদ, ও কাব্যে তাহার প্রকাশ, দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। রসলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত রসসিক্ত কবিচিত্তই উৎকৃষ্ট কাব্যরচনায় সমর্থ হয়। তখন চলিতে থাকে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'

অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দ-লোক করি বিরচন।

আর সেই মধুচক্র নির্ম্মিত হইয়া উঠে যাহাতে কেবল 'গৌড়জন' নহে, বিশ্বের সমস্ত রসিকজন নিরবধি আনন্দে মধুপান করিবে। তখন মধুমক্ষিকার ন্যায় কবি পুনঃ পুনঃ রসসিক্ত অন্তরের কুসুমকাননে উড়িয়া যায়, আর ছন্দিত, অলঙ্কৃত এবং ব্যঞ্জিত বচনামৃত আহরণ করিয়া কাব্যের মধুচক্রে রাখিয়া যায়। মাঝে মাঝে পাঠকের চিত্ত লইয়া আপনার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া পুলকিত হয়—

কত যে বরণ কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া ক'রেছি বয়ন
বাসব-শয়ন তব।

কখনো সংশয় দোলায় দোলে —

সোণার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশীতে ভ'রেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে মনে
ধরা দিলে কি ?

কখনও ক্ষুব্ধ হয়—

মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস
ছিঁড়িল তার।

রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে অনিবার যাতায়াত চলিতে থাকে, আর অনুপম কাব্যের মধুচক্র রচিত হইয়া উঠে। সে কাব্যে ছন্দ, অলঙ্কার, অর্থ এবং অন্যান্য কাব্য-কৌশল রসের অনুগত হইয়া চলে। সেই অবিরাম যাতায়াতের আয়াস কবিচিত্তকে ক্লান্ত করে না—আনন্দ দেয় এবং সে আয়াস কাব্যেও ধরা পড়ে না; কারণ আনন্দে যাহার পরিকল্পনা, আনন্দের মধ্য দিয়াই যাহার গতি, আনন্দেই তাহার পরিণতি ঘটে। কুশলী নর্ত্তকের পদ-বিক্ষেপ-শ্রম যেমন পথশ্রম নহে, নিপুণ নৃত্যের ছন্দে ও ভঙ্গীতে যেমন শ্রমের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে না, বরং তাহার চতুর্দ্দিকে আনন্দই হিল্লোলিত হইয়া উঠে, তেমনি রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে কবির এই যাতায়াতের আয়াস কবিচিত্তকে শ্রান্ত করে না, বা কাব্যে তাহার চিহ্ন রাখিয়া যায় না; কবিচিত্তে ও কাব্যে তাহা আনন্দেরই কারণ-স্বরূপ হয়।

উত্তম-প্রতিভাচালিত কবিচিত্তের কাব্যনির্ম্মাণকালে রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে যাওয়া-আসার ব্যাপারটীও অনুভূতির বিষয়; বুদ্ধি দ্বারা তাহার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায় না; কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে কবিচিত্ত যে রূপ গ্রহণ করে বুদ্ধি দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ করা যায় এবং পণ্ডিতেরা তাহা করিয়াছেন।

শব্দ হইতেছে কাব্যের কঙ্কাল, রীতি (Style) তাহার অবয়ব, অলঙ্কারই তাহার ভূষণ, বাচ্যার্থ তাহার মন, ব্যঞ্জনা তাহার বুদ্ধি ও রস তাহার আত্মা। বুদ্ধি দিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত বুঝা যায়, আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না। কাব্যেরও ব্যঞ্জনা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বুঝান যায় ;—আত্মার কথা, রসের কথা, আপনা হইতে বাদ পড়িয়া যায়, বা অরসিকের কাছে তাহা প্রলাপের মত শুনায়। তবে জীবজগতের ন্যায় কাব্যজগতেও বৈচিত্র্য অসীম। মানব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব,—

কাব্য

অথচ এক মানবের মধ্যেই বৈচিত্র্য কত! আত্মা হইতে কঙ্কাল পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। তথাপি যেমন দুটি মানুষ ঠিক একরকমের নয়, তেমনি অনন্তবৈচিত্র্যময় কবিপ্রতিভার সৃষ্ট দুখানি উৎকৃষ্ট কাব্যও এক রকমের নয়। তাহার পর জীবজগতে যেমন সহস্র পর্য্যায় চলিয়াছে—মন আছে ত বুদ্ধি নাই, অবয়ব আছে ত শ্রী নাই ;—তেমনি ব্যঞ্জনা-বিহীন, রীতিহীন, অলঙ্কারশূন্য, অথবা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তাহাদের সমবায়ে উৎপন্ন বহুবিধ কাব্য উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে। মানবের তুলনায় অন্যান্য জীব যেমন নিকৃষ্ট, তেমনি সর্ব্বাবয়ব-বিশিষ্ট কাব্যের তুলনায় এসমস্ত কাব্য নিকৃষ্ট।

রসকে কাব্যের আত্মা বলা হইয়াছে। আত্মাহীন জীব হয় না, সুতরাং রস না থাকিলে কাব্যও হয় না।

নিকৃষ্ট কাব্যে রস আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়,—রসকে যে উচ্চ পদবী পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে সে রস অবশ্যই নিকৃষ্ট কাব্যে নাই ; রসের ব্যবহারিক অর্থই এখানে করিতে হইবে। এবং এ হিসাবে সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট রসের আস্বাদও যে কাব্যে পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ কাব্যসংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। দর্শনাতীত দর্শনে আত্মার যে সংজ্ঞাই দেওয়া হউক, জীবশৈবালের (Protoplasm) আত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায়। মানবাত্মা ব্রহ্মসামীপ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে,—কোন ইতর জীবের সে সম্ভাবনাও নাই। এইরূপ রসে রসে তারতম্য আছে এবং কাব্যের স্তরভেদও ইহার উপর নির্ভর করে। জীবশৈবালের দেহ ও আত্মা উভয়ই নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া যেমন তাহা জীব হইয়াও নির্জ্জীব, তেমনি দুর্ব্বল বাক্য ও রসের সমবায়ে উৎপন্ন কাব্যকে অকাব্যই বলা যায়। অতি নিকৃষ্ট কাব্যই অকাব্য।

বলা হইয়াছে, শব্দই কাব্যের কঙ্কাল। কঙ্কাল যদি অসমঞ্জস হয়, তবে রীতি সুন্দর হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, সে ভাবোপযোগী সার্থক শব্দচয়ন করিতে সক্ষম হয়।

শব্দচয়নের অক্ষমতা কবিচিত্তের প্রথম ও প্রধান অক্ষমতা।

শব্দ

কুম্ভকার দেবীপ্রতিমা গঠন করিবার পূর্ব্বে বাঁশ, দড়ি ও খড়ের সাহায্যে প্রথমে 'কাটামো' গড়িয়া লয়। যে কুম্ভকার উৎকৃষ্ঠ 'কাটামো' গঠন করিতে সক্ষম নহে, 'কাদার হাত' তাহার যতই ভাল হউক, মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট হয় না। কাব্যগঠনে শব্দের প্রাধান্য অবিসংবাদিত। শব্দসমষ্টি যদি অক্ষম এবং দুর্ব্বল হয়, অথবা তাহারা যদি ভাবোপযোগী না হয়, তবে কাব্যও উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে না।

কাব্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ বাক্য অর্থাৎ কবিতা বুঝি। কিন্তু কাব্যের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়াও বিচার চলিতে পারে, এবং প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সমস্তই কাব্যপর্য্যায়ে পড়িতে পারে। কাব্যের

রীতি ও ছন্দ

ন্যায় ইহাদের প্রত্যেকটীতে শব্দরূপ কঙ্কাল আছে, রীতিরূপ অবয়ব আছে, বাচ্যার্থরূপ মন আছে, ব্যঞ্জনারূপ বুদ্ধি আছে এবং রস বা আত্মাও আছে। প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে ছন্দ নাই, কবিতায় তাহা আছে। কিন্তু ছন্দকে যদি 'রীতির' অঙ্গ মনে করা যায়, তবে নিতান্ত ভুল করা হয় না। শব্দের কঙ্কালের উপর যে বিশেষ অঙ্গসংস্থান যোজনা করিলে সাহিত্য কবিতারূপ গ্রহণ করে, তাহারই অপর নাম ছন্দ।

ছন্দোবদ্ধ বাক্যের অর্থাৎ কবিতার ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট রীতি হওয়ার বাধা নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছন্দোরূপ সাধারণ রীতিটি বর্ত্তমান থাকা চাই। এই হিসাবে রীতিকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—ছন্দিত ও মুক্ত। প্রতিভা ছন্দিত রীতির সাহায্যে ভাবকে বাসনা ও কল্পনার মধ্য দিয়া রসে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পাইলে তাহাকে সাধারণতঃ কবিপ্রতিভা বলি। কিন্তু সে যখন মুক্ত রীতির সাহায্যে ভাবকে রসে উঠাইবার চেষ্টায় গদ্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে, তখনও তাহাকে কবি-প্রতিভা বলিবার বাধা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে আমরা যে 'কবিপ্রতিভা' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে তাঁহার 'বন্দেমাতরম' গানটার জন্যই নহে,—উপন্যাসের মধ্য দিয়া ভাবকে রসমূর্ত্তি দিবার সফল-প্রযত্নতার জন্যই। তবে বঙ্কিমের কবিপ্রতিভা মুক্ত রীতির আশ্রয়ে ভাবকে রসে উঠাইয়াছিল।

দেখা গেল রীতিকে মুক্ত ও ছন্দিত এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। রীতি-বিচারে শ্রবণেন্দ্রিয় আমাদের প্রধান সহায়ক। যাহার 'কান' আছে সেই রীতি ধরিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্ম-কানওয়ালা পাঠকের কাছে মুক্ত রীতিতেও যে এক প্রকারের ছন্দ আছে তাহা ধরা পড়ে। উত্তম গদ্য সাহিত্যের যে কোন অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে

তাহার একটা ছন্দ আছে। তবে সে ছন্দ কবিতার ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সেইজন্যই তাহাকে 'মুক্ত' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে; যদিও 'মুক্ত' অর্থে 'ক্ষিপ্ত' বুঝিলে চলিবে না। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গদ্যরচনা হইতে একথা প্রমাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের অংশ উদ্ধৃত করিয়াও একথা প্রমাণ করা যায়। "রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" এ কাব্যে শব্দসমষ্টি মুক্ত রীতির সাহায্যে গ্রথিত হইয়াছে; কিন্তু ইহারও একটী ছন্দ আছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। ছন্দ যে আছে তাহার প্রমাণ এই, যে শব্দ-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া ইহার ছন্দ-পতন করা যায়। 'রাম' না বলিয়া যদি বলা হয়, 'কাকুৎস্থ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া', তবে ইহার ঈষৎ ছন্দ-পতন ঘটে; রীতি পরিবর্ত্তিত না হইলেও তাহা দুর্ব্বল হইয়া যায়। যদি বলি 'রাজতক্তায় বোসে', তবে যে ছন্দে কবি এখানে বক্তব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—তাহা হইতে ভিন্ন ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মুক্ত বা ছন্দিত উভয় রীতিতেই 'যতি' 'মাত্রা' জ্ঞান যাহার নাই সে সুকাব্য অর্থাৎ সুসাহিত্য রচনা করিতে পারে না। মুক্ত রীতির বিভাগ অনেক এবং সে মুক্ত বলিয়াই তাহার উপবিভাগ অসংখ্য হইতে

পারে,—হইয়াছেও। ইহাকে কোন আইনের শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

কিন্তু ছন্দিত রীতির নানা বিভাগ উপবিভাগ থাকিলেও সে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল বরণ করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহার বিধি-নিষেধ দেশে দেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে বাংলা কাব্যে ছন্দের রূপবিচার করিবার প্রয়াস না করিয়া ছন্দের সাধারণ ধর্ম্মসম্বন্ধে ২।১টা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

উৎকৃষ্ট কাব্যে ছন্দোরূপ কাব্যকৌশল মূল ভাবকে রসে উঠাইবার অনুকূল পরিবেষ্টনী রচনা করিয়া রাখে। এক্ষেত্রে ইহা কল্পনালোকের বিভাবের সহায়ক, এবং অনু ভাব ও উপভাবের পরিপোষক। বিভাব ভাবকে উদ্দিষ্ট রসে উঠাইবার উপযোগী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করে; সুনির্ব্বাচিত ছন্দ এই কার্য্যে তাহাকে সবিশেষ সহায়তা করে।

'নব বর্ষায়' কবিপ্রতিভা বর্ষার গুরু-গম্ভীর নৃত্যের ভাবটীকে রসায়িত করিতে চাহিতেছে,—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

ছন্দ এখানে বিভাবকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ছন্দে বর্ষার গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও নৃত্যের দোলা আছে। ছন্দ যদি কুনির্ব্বাচিত হইত, অর্থাৎ যদি অতিমাত্রায় গাম্ভীর্য্যের দিকে ঝোঁক দিত, কিংবা একেবারে নৃত্য-চপল হইত, তবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক দুইটীর বিভিন্ন বিভাব-দ্বয়কে প্রকাশিত করিতে পারিত না :—

ওগো নদীকূলে তীর-তৃণ-দলে
কে ব'সে অমল বসনে
শ্যামল বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো নদীকূলে তীর-তৃণ-দলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে ?

ইহার বিভাব বর্ষার উদাস-বিহ্বল ভাবটীকে রসমূর্ত্তি দিতে চাহে—ছন্দ তাহাতে বাধা দেয় নাই। আবার,—

ওগো নির্জ্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হ'তেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জ্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

এই শ্লোকের বিভাব বর্ষার নৃত্য-দোদুল ভাবটীকে রসায়িত করিতে চাহিতেছে, এবং ছন্দ তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। এ কবিতা যদি 'বর্ষশেষে' কবিতার ছন্দে লেখা হইত, তবে কবিচিত্ত বর্ষা দেখিয়া ময়ূরের মত আনন্দে নাচিবার সময় পদে পদে বাধা পাইত। আবার ঝঞ্ঝার রুদ্র নৃত্য 'বর্ষশেষের' ছন্দে যেমন ফুটিয়াছে, এ ছন্দে তেমন ফুটিত না :—

আনন্দে আতঙ্কে মিশি' ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হা হা রবে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি' উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত-আঘাতে
উড়ে হোক্ ক্ষয়,
ধূলি-সম তৃণ-সম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

ভাবকে রসে উঠাইতে বিভাব যে পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে,

সুনির্ব্বাচিত ছন্দ তাহার সহায়ক হয়। আবার একই কবিতার বিভাব পরস্পর-বিরোধী না হইয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে; সে সময় ছন্দই মূল ভাবটীর সুর টানিয়া রাখে। কবিচিত্ত কল্পনালোকে সুর-সপ্তকের বিভিন্ন পর্দ্দায় রাগিণীর ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া (অর্থাৎ ভৈরবীতে পূবা ধৈবৎ না দিয়া) নব নব বিভাবের উপর কণ্ঠ খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু ছন্দ তানপূরার ন্যায় তাহার মূল সুরটী রক্ষা করিয়া চলে। মাঝে মাঝে বিভাব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও ছন্দ সে অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়া আনন্দের ধারাটী বজায় রাখে। ছন্দ কুনির্ব্বাচিত হইলে গান জমে না, মাঝে মাঝে রসভঙ্গ হয়।

আবার বিভাবের দ্বারা রসোপযোগী পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি হওয়ার পর অনুভাব ও উপভাবের খেলা আরম্ভ হইলে ছন্দ সেই পরিবেষ্টনীকে রক্ষা করিয়া চলে।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ!

ইহার একটানা ছন্দ ভারাক্রান্ত 'শেষ খেয়াকে' অনুভাব-পরম্পরার মধ্য দিয়া যেন টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; কোথাও তাহা বাধা পায় নাই।

বিভাব অনুভাব উপভাবকে ছন্দ এইরূপে সাহায্য করে বলিয়াই কবিতায় ছন্দের মূল্য অনেক। কিন্তু কবিচিত্ত

যখন ভ্রম, নির্ব্বুদ্ধিতা, খেয়াল বা অক্ষমতাপ্রযুক্ত ছন্দকে বিভাব অনুভাব উপভাবের উপর স্থান দেয়, অর্থাৎ গন্তব্য ভুলিয়া পথের উপর ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন পাঠকচিত্ত পীড়িত হয়। সঙ্গীতের আসরে তানপুরার স্থান নিম্নে নহে, গায়কের স্কন্ধের উপরেই,—কিন্তু কেবল তানপূরা কে কতক্ষণ শুনিতে পারে? কবিচিত্ত যখন গান শুনাইতে আহ্বান করিয়া কেবল তানপূরা ভাঁজিতে আরম্ভ করে, অথবা গানের মধ্যে বাজনাকে প্রবল করিয়া তুলে, তখন পাঠকচিত্তের ধৈর্য্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

অলঙ্কার লইয়া বিচারের প্রয়োজন এখানে দেখি না, এবং শব্দার্থ অথবা বাচ্যার্থ লইয়াও কোন গোল নাই।

ব্যঞ্জনা

কিন্তু ব্যঞ্জনা বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। কোন কাব্যে বাক্যার্থকে ছাড়িয়া যে অর্থান্তরের ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে তাহাই সে কাব্যের ব্যঞ্জনা।

খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।

কবির বলিবার ভঙ্গী হইতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিতেছে, যে ইহা পাখীর কথাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই বা হইবে না—বদ্ধ-জীব ও মুক্ত-জীবের কথাই ইহার বক্তব্য। ইহাই ব্যঞ্জনা।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বিদেশিনীর সহিত কবিচিত্ত যখন অকূল সিন্ধুর মধ্যে তরী ভাসাইয়া চলিতেছে :—

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো
শান্ত ছবি।

তখন সতত-পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্রের বর্ণনারূপ বাক্যার্থকে ছাড়িয়া অদৃষ্টসাথী চিরচঞ্চল মানবজীবনের অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথাই ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাই এ কাব্যাংশের ব্যঞ্জনা। যখন 'পরশপাথর'এর ক্ষ্যাপা

সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোণার বটে,
লোহা সে হ'য়েছে সোণা জানে না কখন।

তখন লোহা ও সোণার বাচ্যার্থকে একেবারে ঢাকিয়া দুঃখময় পার্থিব জীবন ও আনন্দময় অপার্থিব জীবনের কথা মনে আসে—ইহা এই কাব্যাংশের ব্যঞ্জনা।

ব্যঞ্জনা—লঘু, গুরু, গভীর ইত্যাদি নানা পর্য্যায়ের হইতে পারে। পৃথক পৃথক কাব্যাংশের মূল-রসাভিমুখী পৃথক্ পৃথক্ ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে, যেমন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র উদ্ধৃত অংশে ; অথবা সমগ্র কাব্যের একটী মাত্র ব্যঞ্জনা থাকিতে পারে, যেমন 'পরশপাথর'। কাব্যবিচারে ব্যঞ্জনার স্থান অনেক উচ্চে।

কবিচিত্তধারা অনুসরণ করিয়া শব্দ-রীতি-অলঙ্কার এই বহিরঙ্গবিশিষ্ট, এবং বাচ্যার্থ-ব্যঞ্জনা, এই অন্তরঙ্গবিশিষ্ট কাব্য-ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছি। তাহার পূর্ণতর পরিচয় লইয়া শ্রেণী-বিভাগ করিবার পূর্ব্বে, পাঠকচিত্তধারার গতি ও রীতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করি। কঙ্কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সমস্তই বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও জীব বাঁচিতে পারে না, যদি না তাহার খাদ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে। কাব্য বাঁচিয়া থাকে পাঠক-চিত্ত হইতে খোরাক সংগ্রহ করিয়া; সুতরাং কাব্যপরিচয়ে পাঠকচিত্তধারার অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাঠকচিত্তধারা

যেমন কবিচিত্তের, তেমনি পাঠকচিত্তের মূলও সেই বস্তু ও বিষয়-জগতে প্রতিষ্ঠিত। বস্তু বা বিষয়ের সংঘর্ষে পাঠকের মনেও নানারূপ 'ভাব' বা emotion উৎপন্ন হয়, এবং তাহার মনে সেই সেই ভাবের স্মৃতি বা বাসনা সঞ্চিত হয়। বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভাব ও বাসনার ক্ষেত্রে কবি ও পাঠকের মন প্রায় সমধর্ম্মী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কল্পনা কবির বাসনাকে রসে পরিণত করে। ভাব যতক্ষণ ভাবমাত্র থাকে, ততক্ষণ তাহা কবি-কল্পনার উপযুক্ত উপাদান নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট স্তরের কাব্য-রচনা ভাবোদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। পূর্ব্বযুগের কবিওয়ালাগণকে রাগাইয়া দিতে পারিলে এক-

প্রকারের রৌদ্র ও অদ্ভুতরসাত্মক কাব্য পাওয়া যাইত। যদিও অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কাব্য-রচনায় বাসনাই কবিচিত্তের উপাদান, তথাপি ভাবের ক্ষেত্র হইতে ভাবস্মৃতি বা বাসনার ক্ষেত্রে না উঠিয়াও কাব্য রচিত হইতে পারে।

কিন্তু বাসনা-ব্যতিরেকে পাঠকচিত্ত কাব্যাস্বাদনের উপযোগী হয় না। রতি শোক ইত্যাদি ভাবের স্মৃতি যে পাঠকের চিত্তে বাসনা-আকারে সঞ্চিত নাই, তাহার মনে মধুর বা করুণ রসের কাব্য প্রতিফলিত হইতেই পারে না। শঙ্করাচার্য্যের অসাধারণ মনীষা ও পাণ্ডিত্যও উভয়-ভারতীর রতিভাবাত্মক সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ আজন্মব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর মনে রতিভাবের বাসনা সঞ্চিত ছিল না। ভাবের মধ্য দিয়া বাসনা সঞ্চয় করিয়া তবে তিনি প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাসনালোক হইতে পাঠকচিত্ত কাব্যক্ষেত্রে উঠিয়া রসের সন্ধান করে। কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্ত এই কাব্যক্ষেত্রে মুখোমুখী হইয়া আপন আপন প্রকৃতি ও যোগ্যতা অনুসারে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করে। যে পথ দিয়া কবিচিত্ত রস হইতে কাব্যে যাতায়াত করিয়াছে, কাব্যেই তাহার ইঙ্গিত থাকে, কারণ সেই চলাচলের পথে অস্পষ্ট পায়ের দাগ পড়িয়া যায়। সমধর্ম্মী ও সমবাসনাবিশিষ্ট পাঠকচিত্ত কাব্য হইতেই সেই পথের সঙ্কেত পায়। সে পথ স্পষ্ট নহে,

সাঙ্কেতিক মাত্র ; আভাসে, ইঙ্গিতে তাহার সন্ধান মিলে। সেই পথ বাহিয়া পাঠকচিত্ত রসলোকে উত্তীর্ণ হয় এবং সেখানে আবার সেই 'আপন সম্বিতের আনন্দময় চর্ব্বণব্যাপার' আরম্ভ হয়—যেখান হইতে আমরা একবার ফিরিয়া আসিয়াছি। রসলোকে কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের এই যে মিলন, ইহাই নির্ম্মল আনন্দের কারণ এবং কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার এই মিলনের নামই কাব্যরস।

একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা
আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে।

কাব্য-পরিমিতি—অঙ্কণ অধ্যায়

অঙ্কন

প্রথিতযশা নাট্যকার পূজনীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। কলেজে তখন যন্ত্রপাতি বেশী ছিল না, থাকিলেও তাহা ক্লাশে আনিয়া দেখাইবার মত সহকারী ছিল না। অধ্যাপক বাক্যের সাহায্যে রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষাগুলি বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যখন বুঝিতেন, ব্যাপার আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তখন তিনি তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ বামহস্ত সম্মুখে আনিয়া তাহার অঙ্গুষ্ঠটী উচ্ছ্রিত করিয়া ধরিতেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ঠেকাইয়া বলিতেন— Suppose this is a test tube; I fill one-third of it with Sodium Chloride:—ধর ইহা একটী টেষ্ট্ টিউব, আমি ইহার এক তৃতীয়াংশ লবণ দ্বারা পূর্ণ করিলাম। অমনি ব্যাপারটী পরিষ্কার হইয়া আসিবার পথে দাঁড়াইত; মানবমন এমনই প্রতিমা উপাসক।

আমার প্রথম রসায়ন-শিক্ষা উক্ত অধ্যাপকের নিকট হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয়, যখন দেখিলাম কাব্যসম্বন্ধে এত কথা বলিয়াও ব্যাপারটী ঠিক উপলব্ধ হইতেছে না, তখন কাগজ পেন্সিল লইয়া মনকে বলিলাম,—ধর এইটী কবিচিত্তের গতিপথ, আর এইটী পাঠকচিত্তের গতিপথ; ইহা

ভাবলোক, ইহা বাসনা-লোক, এইটী কল্পনা-লোক। এইরূপে আমার প্ল্যান-অঙ্কনে অভ্যস্ত চিত্ত লোকের পর লোক আঁকিয়া লোকোত্তর রসের সন্ধানে ব্যাপৃত হইল। নিজেকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অনেক পরিশ্রমে কাব্য-দর্শনের যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হইল তাহার মূর্ত্তি দেখিলাম (চিত্র দেখুন) ডিম্বাকার! প্রথমেই মনে হইল এত চেষ্টার ফলে যাহা বুঝিয়াছি তাহার প্রতীক কি এই অশ্বডিম্ব! পরক্ষণেই মনে হইল ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড মাত্র, সুতরাং আমার লজ্জিত হইবার কারণ নাই। বরং দেখিলাম—কবি, কাব্য ও পাঠকের যে ধারণা ও শ্রেণী বিভাগ আমার মনের কোণে অনেক দিন হইতে অস্পষ্টভাবে সঞ্চিত ছিল, তাহা এই রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝা ও বুঝান সহজ-সাধ্য হইয়াছে।

চিত্রে দেখিতেছি কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারা উভয়েরই উৎপত্তিস্থল বস্তুজগৎ। তাহার পর কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারা ভাবলোকে পৌঁছিয়াছে। এ ভাবলোকও অভিন্ন; কেবল উভয়চিত্তধারার মধ্যস্থলে ভাবলোক-পরিধির ঈষৎ সঙ্কোচের দ্বারা কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তে ভাবের ঈষৎ বিভিন্ন প্রভাব সূচিত করিতেছে। তাহার পর উভয় ধারার বাসনালোক ভিন্ন হইলেও পরস্পর স্পর্শ করিয়া আছে। কবিচিত্তের ভাবস্মৃতি ও পাঠকচিত্তের ভাবস্মৃতি মূলতঃ একশ্রেণীস্থ হইলেও তাহাদের প্রকৃতির ভেদরেখা সুস্পষ্ট।

কবিচিত্ত বাসনা হইতে কল্পনায় ও পাঠকচিত্ত বাসনা হইতে কাব্যে উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি রসলোক।

চিত্রে কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে কাব্যে দক্ষিণাবর্ত্তে (Clockwise) দেখান হইয়াছে, এবং পাঠকচিত্ত বামাবর্ত্তে দেখান হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় কাব্য-সৃষ্টি ও তাহার আস্বাদ গ্রহণ পরস্পর বিপরীতাভিমুখী। কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে কাব্যে পৌঁছিতে রস অতিক্রম করিয়া যায়, আর পাঠকচিত্তধারা রসে পৌঁছিতে কাব্য অতিক্রম করিয়া যায়। একের যাহা গন্তব্য, অপরের তাহা পথিমধ্যস্থ বিশ্রাম স্থান। কবিচিত্তের উদ্দেশ্য রস নহে, রস আনিয়া কাব্যে সঞ্চয়; আর পাঠকচিত্তের উদ্দেশ্য কাব্য নহে, কাব্য হইতে রস-সংগ্রহ।

যে কাব্যরসকে ব্রহ্মস্বাদের তুল্য বলা হইয়াছে সেই রসের কথাই কহিয়া আসিতেছি। কিন্তু সাধারণ হিসাবে রসের পর্য্যায় ও স্তরভেদ আছে। অতি সাধারণ কাব্য পাঠে অতি সাধারণ পাঠকও যে আনন্দ পায় ইহা সত্য। ইহাকে রস বলা চলে না। উপস্থিত আনন্দই বলিব, যদিও ইহাতেও আপত্তি উঠিতে পারে। পূর্ব্বে যে কবিচিত্তধারার পরিচয় দিলাম, যাহা বস্তু হইতে উৎসারিত হইয়া ভাব, বাসনা ও কল্পনার পথে রসে উঠিয়া কাব্যে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহা উত্তমপ্রতিভা-প্রেরিত কবিচিত্তের ধারা। পাঠক-

চিত্তের ধারাও ভাব ও বাসনার মধ্য দিয়াই কাব্যে পৌঁছে এবং উৎকৃষ্ট পাঠকচিত্তধারা সেখান হইতে রসলোকে উত্তীর্ণ হয়। পাঠকচিত্ত যদি কেবল রসজ্ঞ না হইয়া রসজ্ঞ ক্রিটিক্ উভয়ই হয়, তবে সে রসলোকেই থামিয়া যায় না, সেখান হইতে রসসিক্ত অন্তরে কবিচিত্তধারার প্রতিবর্ত্তন করিয়া কবির বিচিত্র কল্পনারাজ্যে নামিয়া আসিবার প্রয়াস পায়।

রস-প্রত্যাবৃত্ত কাব্যই উচ্চ শ্রেণীর কাব্য, আর তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে,—রসের সমুচ্চ লোকে উঠিবার শক্তিবিশিষ্ট পাঠকচিত্ত। উত্তম শ্রেণীর বিপরীতাভিমুখী এই দুই ধারা রসলোকে পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া যে আনন্দ উৎপন্ন করে তাহাই ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কিন্তু এতদ্ভিন্ন কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অন্যান্য পথও থাকিতে পারে, এবং তাহাদের মিলন-জনিত ভিন্ন বর্গের আনন্দও স্বাভাবিক। এই কথাই চিত্র-সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কাব্য রচনা করিবার জন্য যেমন কবির প্রয়োজন, তেমনি তাহার আস্বাদন জন্য পাঠকের প্রয়োজন। যে কাব্য কল্পিত হইল, কিন্তু লিখিত হইল না, তাহা সুকাব্য কি অকাব্য একথা উঠিতে পারে না। যে কাব্য রচিত হইয়াছে কিন্তু কখনও পঠিত হইল না, তাহার সম্বন্ধেও ঐ

একই কথা। কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার মিলনের ফলই কাব্যরস। এই দুই ধারা যে পথেই প্রবাহিত হউক, যদি প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টীর মিলন হয়, তবেই আনন্দ জন্মে। যে ক্ষেত্রে মিলন হইল না, সে ক্ষেত্রে কাব্য বিফল। সম ও বিষম (positive & negative) তড়িৎ যদি কোন পরিবাহচক্রে (cycle) অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে, তবেই তাড়িৎ শক্তি প্রকাশ পায়; চক্রের মধ্যে অবচ্ছেদ (break) থাকিলে তাহা ব্যর্থ হয়। সেইরূপ কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়ন-চক্র যেখানে অব্যাহত থাকে, সেইখানেই আনন্দ উৎপাদিত হয়। তাড়িৎ প্রবাহের বেগ, প্রকৃতি ও পরিমাণ যেমন তাহাদের উৎপাদক সম ও বিষম শক্তিদ্বয়ের উপর নির্ভর করে, তেমনি কাব্যায়নচক্রে উৎপাদিত আনন্দের প্রকৃতি ও পরিমাণ তাহাদের উৎপাদক কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার উপর নির্ভর করে। কথাটী বিশদ করি।

চিত্রে দেখা যায়, কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে উদ্গত হইয়া প্রথমে ভাবলোকে পৌঁছে; সেখান হইতে সরাসরি কাব্য-ক্ষেত্রে যাইবার একটী পথ রহিয়াছে। ভাব হইতে ঋজু-রেখায় কাব্যে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে যে উল্লেখ করিয়াছি, কবি বা তর্জ্জাওয়ালাদের রাগাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ রৌদ্ররসের একপ্রকার কাব্য জন্মে,

তাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর। ভাব অর্থাৎ emotionএর জন্মমাত্র কাব্যরচনা একান্ত অসম্ভব মনে হয় না। কলিকাতার রাজপথে যখন হাঁকিয়া যায়,—

বাপ্‌রে বাপ্, বিষম কাণ্ড,
উল্টে বুঝি যায় ব্রহ্মাণ্ড!
পেটের ছেলে আপন হাতে
কাট্‌লে মাযে নিশুৎ রাতে!
একটী পয়সা খরচ কোরে,
বাবুরা সব দেখুন প'ড়ে।

তখন কবিচিত্ত সে কাব্যে ভাব হইতে বাসনালোকে উঠিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। কোন ব্যাপার ঘটিবামাত্র ভাবটী কবিচিত্তে স্মৃতির জগতে, অর্থাৎ বাসনায়, রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর কাব্য জন্মলাভ করে। ইহাদিগকে 'ভাবসমুখ-কাব্য' বলা যায়। প্রাণীজগতে মেরুদণ্ডহীন জীব যে শ্রেণীর, কাব্য-জগতে ভাবসমুখ কাব্যও প্রায় সেই শ্রেণীর।

ভাবসমুখ কাব্য

কিন্তু কে অস্বীকার করিতে পারে যে এ শ্রেণীর কাব্যেরও পাঠক আছে এবং তাহারা ইহা হইতেই আনন্দ পায়? আনন্দ যখন পায়, তখন ব্যাপারটীকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আনন্দ পাইবার কারণ এই, যে এক শ্রেণীর পাঠকচিত্ত আছে, যাহারা কাব্য হইতে কেবল

emotionএ, ভাবেই, নামিতে চাহে ; কল্পনা কি রসলোকের খোঁজ তাহারা রাখে না। বীর-রসের কাব্য পড়িয়া তাহারা সরাসরি 'উৎসাহে' নামিয়া আসে, হয়ত বিপ্লবীব দলে নাম লেখায় ; রৌদ্ররসের অভিনয় দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জুতা খুলিয়া মারে ; মধুর-রসের কাব্যে তাহারা কেবলই রতিভাব খোঁজে। এ শ্রেণীর পাঠকচিত্তধারা রস বা কল্পনায় উঠিতে সমর্থ নয় এবং ইহাদের 'ভাব-মুখী পাঠকচিত্ত' বলা যায়। ভাবসমুখ কাব্যে

ভাবমুখী চিত্ত

কবিচিত্তধারা যেমন ভাব হইতে কাব্যে সিধা উঠিয়া গিয়াছে, ভাবমুখী পাঠকচিত্তের ধারাও সেইরূপ কাব্য হইতে ভাবে সিধা ফিরিতে চায় ; সুতরাং অয়ন চক্র সম্পূর্ণ হইয়া এক প্রকারের আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। 'রসোন্মুখী' পাঠকচিত্তধারা কাব্য হইতে রসে উঠিতে চাহে, তাহার পথ ভিন্ন ; ভাবসমুখ কবিচিত্তধারার সহিত চক্র সম্পূর্ণ না হওয়ায় আনন্দ বহে না।

ভাবসমুখ কাব্য যে ছন্দে, অলঙ্কারে, শ্রীহীন হইবে, এমন কোন কথা নাই। বাচ্যার্থ ছাড়া ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা রসের ব্যঞ্জনা নহে, ভাবের ব্যঞ্জনা। হেমচন্দ্র যখন রেলগাড়ী দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

এস কে বেড়াতে যাবে, শীঘ্র কর সাজ,
ধরায় পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ, ত্বরা করি',
বাক্স ব্যাগ তল্পি ধরি',
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং ঠং ঠং কাঁশি।...

কিম্বা,—

ছেলাম টেম্পল্ চার্চ', আচ্ছা মজা নিলে,
ভোজং দিয়ে ভোটীং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।

তখন তিনি বাসনা-লোকেও উঠেন নাই।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে-রে ভাই!

এই জাতীয় অধিকাংশ জাতীয় সঙ্গীতের কাব্যাংশ ভাবসমুখ কাব্যের দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

সসঙ্কোচে উল্লেখ করিতে হয়, আদি-কবির প্রথম শ্লোকটী কোন্ শ্রেণীর কাব্য? কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে ব্যাধ শরবিদ্ধ করায় তাঁহার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ যে শ্লোক নির্গত হইল, তাহাতে তিনি ব্যাধকে অভিসম্পাত দিয়াছেন। ইহা তাঁহার শোকার্ত্ত হৃদয়ের স্বতঃ ও সদ্যো-নিস্থত ছন্দোবদ্ধ বাক্য। তাঁহার সেই শোকভাব স্মৃতির স্তর বাহিয়া কল্পনান্তরে উঠিবার অবসর পায় নাই। ইহাকে ভাবসমুখ কাব্য বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় বলিয়া মনে হয়

না। আদি কবির এই প্রথম রচনাকে যদি কাব্য-জগতের জীব-শৈবাল (protoplasm) বলা হয়, তবে তাহাতে আপত্তিরই বা কি কারণ থাকিতে পারে? জীব-শৈবালে জীব-জগতের অসীম বৈচিত্র্যের কোন চিহ্নই নাই; তথাপি তাহা জড় হইতে জীবের প্রথম অভিব্যক্তি বলিয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিকের আদরের বস্তু। কবিগুরুর মুখনিঃসৃত এই প্রথম শ্লোকও প্রত্যেক কবি ও রসিকের কাছে সেই হিসাবে আদরের জিনিষ। ইহার বেশী আর কিছুই এ শ্লোকে নাই এবং কবিগুরুর পরজীবনের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

বলা বাহুল্য কবিচিত্তধারার বিশ্লেষণ করিয়া আমি কবিদের জাতি বিভাগ করিবার প্রয়াসী নহি। কাব্যের শ্রেণী-বিভাগ করাই আমার উদ্দেশ্য। কোনও কাব্যে কবিচিত্তের যে রূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সে কাব্যে কবিচিত্তের জাতি ও কাব্যের জাতি অভিন্ন, অর্থাৎ ভাবসমুখ কাব্যে কবিচিত্তও ভাবসমুখ। কিন্তু কোন বিশেষ কবির চিত্তকে স্থায়ীভাবে ভাবসমুখ চিত্ত বলা অতীব দুঃসাহসের কথা এবং তাহা সত্যও নহে।

বাসনাসমুখ কাব্য ও বাসনামুখী চিত্ত

ভাবলোকের ঊর্দ্ধে স্মৃতির জগৎ,—বাসনালোক। যে কাব্যে কবিচিত্ত 'বাসনা' হইতে সিধা কাব্যক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে 'বাসনাসমুখ কাব্য' বলা যায়। এ শ্রেণীর কাব্য ভাবসমুখ কাব্য হইতে বিশেষ উন্নত না হইলেও ইহার ধারা বিভিন্ন। কবিচিত্ত ভাব বা emotion হইতে

প্রত্যক্ষভাবে মালমশলা সংগ্রহ না করিয়া তাহার স্মৃতি বা বাসনা হইতে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে। এ কাব্যে 'রসোন্মুখী' পাঠকচিত্ত তৃপ্ত হইতে পারে না। 'বাসনামুখী' পাঠকচিত্ত—যাহা কাব্য হইতে প্রত্যক্ষভাবে বাসনালোকে নামিবার পক্ষে উপযোগী ও তাহারই জন্য উন্মুখ, তাহা—এইরূপ কবিতা হইতে আনন্দলাভ করে। এখানেও কবি-চিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়ন চক্র বাসনার মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এ কাব্যের আনন্দ এই জাতীয় পাঠকের মনে প্রতিভাত হইয়া উঠে। বাসনামুখী পাঠক-চিত্ত ভাবমুখী পাঠকচিত্তকে অপেক্ষাকৃত অশ্রদ্ধা করে এবং রসোন্মুখী পাঠকচিত্তকে সম্ভ্রম করে, অথবা অগ্রাহ্য করে। রতিবাসনাজাত কাব্য বাসনামুখী পাঠকচিত্তে রতিবাসনা-জনিত আনন্দ দায় এবং তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট। এ কাব্য বা পাঠক মধুর রসের ধার ধারে না। ইহাতে ছন্দ, অলঙ্কার, এমন কি ব্যঞ্জনাও—যাহা বাসনার ব্যঞ্জনা, রসের নহে—থাকিতে পারে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক অংশ এই বাসনাসমুখ কাব্যের উজ্জ্বল উদাহরণ-স্থল। শঙ্করা-চার্য্যের 'মোহমুদ্গর' নির্বেদ ভাবের (শমভাবের উপভাব) বাসনাসমুখ কাব্যের উদাহরণ। ঈশ্বরগুপ্তের 'পাঁটা' বা 'তপ্সে মাছ', হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র অনেক কবিতা এই বাসনাসমুখ কাব্য-পর্য্যায়ে

পড়িতে পারে। অল্পশক্তি-বিশিষ্ট কবিদের অনেক কাব্য ছন্দ, অলঙ্কার, এমন কি ব্যঞ্জনা-সংযুক্ত হইয়াও বাসনা-সমুখ পর্য্যায়ের ঊর্দ্ধে স্থান পাইতে পাবে না।

ভাবসমুখ ও বাসনাসমুখ কাব্যকে এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলা যাইতে পাবে। কারণ অয়নচক্র সম্পূর্ণ করিয়া এই দুই জাতীয় কাব্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে পাঠক-চিত্তকে কাব্যক্ষেত্র হইতে নিম্নাভিমুখে ভাব বা বাসনালোকে নামিতে হয়। রতিভাব বা রতিবাসনা দুইএর কোনটাই উচ্চাঙ্গের বস্তু নয়। আর রসশাস্ত্রের মাপকাটিতে কাম-ভাবের উদ্রেক আর বৈরাগ্যভাবের উদ্রেক এক শ্রেণীতেই পড়ে, কারণ মধুর রস ও শান্ত রস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। এ রাজ্যে ভাব ও বাসনার স্থান নিম্নে, কল্পনালোক তাহাদের ঊর্দ্ধে এবং রসলোক শীর্ষে অবস্থিত। সেই জন্য ভাবসমুখ ও বাসনাসমুখ কাব্য একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত নিম্নজাতীয় কাব্য। ভাবমুখী ও বাসনামুখী পাঠকের অভাব কোন কালেই হয় নাই, সেইজন্য এই জাতীয় কাব্যেরও অসদ্ভাব নাই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা নিম্নস্তরের জীবদেহের ন্যায় ক্ষণে জন্মে, ক্ষণে মরে; আর কোনও রূপে আপনাদের ধারাটী বজায় রাখিয়া চলে।

লতা স্বভাবতঃ উদ্ধদেশে উঠিতে অক্ষম। মাটীর উপর লতাইয়া বেড়ানই তাহার ধর্ম্ম এবং গো-মহিষাদির ভক্ষ্য

হওয়াই তাহার ভাগ্য। কিন্তু দণ্ডসাহায্যে সে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, এবং মাচায় উঠাইয়া দিলে গো-মহিষাদির মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ফল ফলাইতেও পারে। শক্তিশালী কবির রচিত অনেক বাসনাসমুখ কাব্যও মধুর ছন্দ, চতুর অলঙ্কার ও সবল রীতির আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া আছে এবং ফলও ফলাইয়াছে; কিন্তু তাহা কোন দিনই অমৃতফল নহে।

কল্পনাসমুখ কাব্য ও কল্পনামুখী চিত্ত

এইবারে যে দেশের কথা কহিব – কল্পনালোক—সেখানে বুদ্ধির প্রবেশ নিষিদ্ধ না হইলেও সে মাঝে মাঝে দিশা হারাইয়া ফেলে। কবিচিত্তধারা যখন কল্পনালোক হইতে বিভাব, অনুভাব ও উপভাব দ্বারা পুষ্ট হইয়া মর্মশীর্ষে অবস্থিত কাব্যক্ষেত্রে ছন্দ, রীতি, অলঙ্কার ও অর্থ সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়, তখনকার কাব্য ভিন্ন বস্তু। আমরা ইহাকে 'কল্পনাসমুখ' কাব্য বলিব। কবিচিত্ত কল্পনার ভিতর দিয়া গিয়াছে, সুতরাং সাধারণ লৌকিক মনের ঊর্দ্ধে সে উপচার সংগ্রহ করিয়াছে। কল্পনাসমুখ কাব্যের কবিচিত্তধারা অয়নচক্র সম্পূর্ণ করে,—'কল্পনামুখী' পাঠকচিত্তধারার সহিত; সুতরাং এ কাব্যের আনন্দ কল্পনামুখী পাঠকচিত্তেই সম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়। রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত ইহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করিতে পারে না, আর বাসনামুখী কিম্বা ভাবমুখী পাঠকচিত্ত আভিজাত্যের জন্য ইহাকে সমীহ করিলেও আনন্দ পায় না।

অয়নচক্র সম্পূর্ণ হওয়া না হওয়াই এই আনন্দ বা অবজ্ঞার কারণ; যেহেতু কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অবচ্ছেদহীন প্রবাহই আনন্দ।

কল্পনাসমুত্থ কাব্যে কবিচিত্ত বুদ্ধি দ্বারা মাজ্জিত; বিভাব-অনুভাব-উপভাব সম্বন্ধে জাগ্রত; শব্দচয়ন, ছন্দোবন্ধন, অলঙ্কার-নির্ব্বাচন, বাচ্যার্থবোধ ও ব্যঞ্জনার প্রয়োজন—ইহাদের যথাযথ জ্ঞান তাহার আছে। এক কথায় কবিচিত্ত তাহার আদর্শ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ। রসের উদ্বোধ তাহাকে করিতে হইবে, এবিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার প্রতিভা কাব্যসৃজনকালে রসাকাঙ্ক্ষী হইলেও রসোন্মুখী না হওয়ায় রসের দিকে উঠিবার চেষ্টামাত্র করিয়াই কাব্যে নামিয়া আসে। কল্পনায় বিভাব এক অংশে সবল হইল, কিন্তু অপর অংশ হয়ত তাহাকে খণ্ডিত করিল; বিভাব উপযোগী হইলেও, অনুভাব-উপভাব বিরুদ্ধ হইয়া বেসুর বাজাইয়া দিল; শব্দ রীতি অলঙ্কার সুন্দর হইয়াও অর্থ ব্যঞ্জনার ধাপে উঠিল না, অথবা ব্যঞ্জনা দুর্ব্বল হইল; ছন্দ ও রীতি অর্থকে চাপা দিল; অলঙ্কার ব্যঞ্জনাকে ভাঙিয়া দিল; কিম্বা বিশ্লেষণ-বুদ্ধি দ্বারা কোন মহৎ দোষ ধরা না পড়িলেও রস দানা বাঁধিল না। ইহার একমাত্র কারণ—কবিচিত্তধারা সেই কাব্যবিশেষে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রসলোক ঘুরিয়া আসে নাই; হয় তাহার অভিনয় করিতেছে, নয়

রসোদ্বোধ সাধ্যাতীত বুঝিয়া কাব্যের বহিরঙ্গে বিলাস করিতেছে।

কল্পনাসমুখ কাব্যের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে—বিভাব, অনুভাব, উপভাব, শব্দ, ছন্দ, রীতি, অলঙ্কার, বাচ্যার্থ, ব্যঞ্জনা সমস্তই ইহাতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের সামঞ্জস্যের অভাব থাকে এবং তাহারা সুসংস্থিত হয় না। মূল ভাবটী রসে পরিবর্ত্তিত হইলে উক্ত কাব্য-কৌশল-পরম্পরা পরিমাণে, মাত্রায় ও বিন্যাসে স্বতঃই যথাযথ হয়, কিন্তু কল্পনাসমুখ কাব্যে এইগুলির অভাব ঘটে। কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত বলিতে সেই চিত্ত বুঝিতে হইবে, যাহা এই সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করে না, বা তাহা দ্বারা পীড়িত না হইয়া অসমঞ্জস কাব্যকৌশল হইতেই আনন্দ লাভ করিতে পারে। বলিষ্ঠ রীতিমাত্র যাহাকে সচকিত করে, সুন্দর ছন্দই যাহাকে মুগ্ধ করে, চতুর অলঙ্কার যাহাকে বিস্মিত করে, সবল বিভাব-অনুভাব-উপভাব মূল ভাবের বিরোধী হইলেও যাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও রসবিমুখীনতা যাহার গোচরীভূত হয় না, অংশের আনন্দই যাহার পূর্ণের তৃষ্ণাকে শমিত করে, তাহাই কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত।

বলা বাহুল্য, কল্পনাসমুখ কাব্যই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আর কল্পনামুখীচিত্তসম্পন্ন পাঠক ততোধিক।

সংখ্যায় বহু এবং আভিজাত্যসম্পন্ন বলিয়া এই কাব্যে নানা স্তরবিভাগের চেষ্টা হয়; কোন্ কবি কাহার অপেক্ষা বড়, কোন্ কাব্যের ওজন কত, তাহার বিচার লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। চিত্রে সমশীর্ষে অবস্থিত কল্পনা-লোক ও কাব্যক্ষেত্রের উপর এবং রসলোকের নিম্নে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া আছে,—যাহার মধ্যে সংখ্যাতীত বক্ররেখা কল্পিত হইতে পারে। রসলোক হইতে তাহাদের দূরত্বানুযায়ী কাব্যকে উচ্চ-নীচ মর্য্যাদা দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন রেখাটী রসলোক ঘুরিয়া আসে নাই; সুতরাং রসোন্মুখী পাঠকচিত্তের সহিত অয়ন-চক্র সম্পূর্ণ না হওয়ায় আনন্দ উৎপন্ন হয় না। অল্পসংখ্যক রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত বলে—'ইহাতে রস কোথায়?' সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বুদ্ধিমান কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত বলে—'আমরা আনন্দ পাইতেছি, সুতরাং রস আছে,—খুঁজিয়া দেখ।'

কল্পনামুখী ও রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত সম্বন্ধে আর একটী কথা এইখানে বলা উচিত মনে করি। একই পাঠকের চিত্ত কোনও কাব্যে রসোন্মুখী, কোনও কাব্যে কল্পনামুখী হওয়া বিচিত্র নয়। ইহার কারণ 'বাসনা'র তারতম্য। যে ভাবের বাসনা যে চিত্তে দুর্ব্বল, সে চিত্তে উক্ত ভাবের রসমূর্ত্তি পূর্ণ প্রতিভাত হইতে পারে না। সুতরাং পাঠকবিশেষের চিত্ত কোনও এক রসের কাব্যে রসোন্মুখী হইলেও অপর

রস-সম্বন্ধে সে কল্পনামুখী হইতে পারে। তবে রসোন্মুখী পাঠকচিত্তের পক্ষে কখনও রসবিশেষে স্থায়ীভাবে বাসনামুখী বা ভাবমুখী হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না; যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাসনাসমুখ কাব্য ও ভাবসমুখ কাব্য নিম্নতর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বুঝিতে চেষ্টা করি। ইহা অসম্ভব নহে যে শান্ত, করুণ, মধুর রসের অধিকারী কোন রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত 'ক্ষুধিত পাষাণ'এ কবিপ্রতিভা 'ভূতভয়-ভাব'টীকে যে অপরূপ 'ভয়ানক রস'এ রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিল না; কারণ তাহার অন্তরে ভূতভয়-ভাবের বাসনা দুর্ব্বল ছিল। এক্ষেত্রে সেই পাঠকচিত্ত 'কল্পনামুখী' হইয়া কল্পনার আনন্দই লাভ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া সে একেবারে ভাবলোকে নামিয়া আসিয়া ভাবমুখী পাঠকচিত্তের ন্যায় 'ভূত-ভয়-ভাব' খুঁজিবে ইহা অসম্ভব। এক রসে রসিক চিত্ত অন্য রসে পূর্ণ মাত্রায় অরসিক হইতে পারে না।

রসোত্তীর্ণ কাব্য ও রসোন্মুখী চিত্ত

কবিচিত্ত যখন রসলোকে উত্থিত হইয়া কাব্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন কাব্যকে 'রসোত্তীর্ণ কাব্য' বলা যায়। এ কাব্যের পূর্ণ বিচার বুদ্ধিদ্বারা চলে না, ইহা অনুভূতিসাপেক্ষ। রসোত্তীর্ণ কাব্যের প্রকৃত বোদ্ধা—রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত, কারণ রসলোকের মধ্য দিয়া এই দুই ধারার অয়ন-চক্র সম্পূর্ণ ও

সার্থক হইয়াছে। এই মিলনের আস্বাদ সেই নিজের সম্বিতের আনন্দময় চর্ব্বণ-ব্যাপার। সুতরাং এই লোকোত্তর লোকে দাঁড়াইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। এখান হইতে নামিয়া কাব্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রসোত্তীর্ণ কাব্যের যৎসামান্য আনন্দপরিচয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন চেয়ে ব'সে রও?
কথা কও, কথা কও।
যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর-তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
হেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কল-কল ভাষ নীরব তাহার,
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন
তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

অতীতের প্রতি যাহার কোনদিন কোন দরদ নাই, অর্থাৎ যাহার চিত্তে এই ভাবের বাসনা সঞ্চিত নাই, তাহার

কথা একেবারেই বাদ দিতে হইবে; কারণ বাসনাহীন পাঠকচিত্ত কাব্যবিচারের বাহিরে। কিন্তু অতীতের প্রতি দরদসম্পন্ন চিত্তে সন্দেহ থাকে না, যে কবিচিত্ত এখানে অতীতের বাসনাসাগরে স্নান করিয়া এইমাত্র উঠিয়া আসিল। ইহার শব্দ, রীতি, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনার বিচার পৃথক্‌ভাবে কে করে? কি ইহার বিভাব, কি অনুভাব, তাহাতেই বা কাহার প্রয়োজন? কেবল বুঝা যায় কবিচিত্ত এইমাত্র লোকোত্তর তীর্থে অতীতের যে রসমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল, আপনার শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কার-অর্থ সমস্তই একমুখী করিয়া সেই অতীতের বোধন করিতেছে। পাঠকচিত্তে রসলোকস্থিত সেই অতীতের ভীষণ-কান্ত মূর্ত্তি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠে :—

যুগযুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর-তলে।

ইহার মধ্যে দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যাপ্তি, তাহার আনন্দ মনকে প্রসারিত করিয়া দায়।

সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কল-কল ভাষ নীরব তাহার।

ইহার বিপুল নিস্তব্ধতা ও প্রশান্তি চিত্তকে অভিভূত করে।

তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন!

ভয়ের ভাব নয়, ভয়ের বাসনা নয়, ভয়ের কল্পনা নয়, ভয়ের আনন্দ ইহাতে জাগিয়া উঠে,—যাহাকে 'ভয়ানক রস' বলা হয়।

কবিচিত্ত আর একবার রসলোকে ডুব দিয়া আসিয়া বলিতেছে—

তব সঙ্কার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে!

কে একথা অবিশ্বাস করিতে পারে? পাঠকচিত্ত আপনা হইতে অন্তর্মুখী হইয়া আপনার মর্ম্মে অতীতের সঞ্চয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠে। এমনি করিয়া কবিচিত্ত-ধারা ও পাঠকচিত্তধারার মিলনে রসের আস্বাদন চলিতে থাকে—যাহা সংসার-বৃক্ষের অমৃতময় ফল; আর যে ফলে নিম্নাধিকারী পাঠকচিত্ত চিরবঞ্চিত।

সিদ্ধান্ত

চিত্র-সাহায্যে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল যে কবিচিত্ত, কাব্য ও পাঠকচিত্ত ইহাদের প্রত্যেকটী চার শ্রেণীতে বিভক্ত। সৃষ্ট কাব্য হইতে যে চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই সে কাব্যের কবিচিত্ত, সুতরাং কবিচিত্ত ও কাব্যের পৃথক্ ভাবে শ্রেণীনির্দ্দেশ নিষ্প্রয়োজন। রসোত্তীর্ণ কবিচিত্ত ও রসোত্তীর্ণ কাব্য সমসংজ্ঞায় পড়ে। কাব্যের বিভাগ,—

(১) ভাবসমুখ কাব্য।

(২) বাসনাসমুখ কাব্য।

(৩) কল্পনাসমুখ কাব্য।

(৪) রসোত্তীর্ণ কাব্য।

পাঠকচিত্তের বিভাগ,—

(১) ভাবমুখী চিত্ত।

(২) বাসনামুখী চিত্ত।

(৩) কল্পনামুখী চিত্ত।

(৪) রসোন্মুখী চিত্ত।

ইহাদের মধ্যে ভাবসমুখ কাব্যের সহিত ভাবমুখী চিত্তের, বাসনাসমুখ কাব্যের সহিত বাসনামুখী চিত্তের, কল্পনাসমুখ কাব্যের সহিত কল্পনামুখী চিত্তের, রসোত্তীর্ণ কাব্যের

সহিত রসোন্মুখী চিত্তের অয়নচক্র সম্পূর্ণ হওয়ায় আনন্দের উৎপত্তি হয়, যদিও সেই সেই আনন্দের প্রকার ও পরিমাণের তারতম্য আছেই। রসোত্তীর্ণ কাব্যের সহিত (অর্থাৎ কাব্য-বিশেষে প্রকাশিত রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের সহিত) রসোন্মুখী (পাঠক) চিত্তের যে মিলন, তাহাই শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ-স্বরূপ হয় ; এই আনন্দেরই অপর নাম 'রস'।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভাবসমুখ কাব্য ও বাসনাসমুখ কাব্য এক-গোত্রীয় এবং হীন-গোত্রীয়। তজ্জনিত আনন্দকে 'আনন্দ' না বলিয়া 'বিলাস' বলা সমীচীন মনে করি, নচেৎ 'আনন্দ' শব্দটীর জাতি নষ্ট করা হয়। তাহা হইলে সূত্র এইরূপ দাঁড়ায় :—

১। ভাবসমুখ কাব্য + ভাবমুখী চিত্ত = ভাববিলাস।

২। বাসনাসমুখ কাব্য + বাসনামুখী চিত্ত = বাসনাবিলাস।

৩। কল্পনাসমুখ কাব্য + কল্পনামুখী চিত্ত = কল্পনানন্দ।

৪। রসোত্তীর্ণ কাব্য + রসোন্মুখী চিত্ত = রস।

যে চারটী পৃথক্ অয়নচক্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের নাম যথাক্রমে—১। ভাববিলাস চক্র } বিলাস-চক্র
২। বাসনাবিলাস চক্র }
৩। কল্পনানন্দ চক্র বা আনন্দ-চক্র
৪। রসচক্র

—রাখা যাইতে পারে।

ভাব হইতে কাব্যে পৌঁছিবার রেখাপথ একাধিক কল্পিত হইতে পারে, সুতরাং ভাববিলাসচক্রও একটী নহে—অনেক। কিন্তু এই চক্রের অধিকাংশ রেখাপথ বাসনালোক খণ্ডিত না করিয়া যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে খাঁটি ভাববিলাস চক্র অতি অল্প। প্রত্যেক চক্রেই বাসনার অল্পাধিক মিশ্রণ থাকে।

বাসনালোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে পৌঁছিবার বহু রেখা-পথ অঙ্কিত হইতে পারে, সুতরাং বাসনাবিলাস চক্রের সংখ্যাও অনেক। ইহাদের আপেক্ষিক গুণবিচার রেখা-চিত্রে চক্রের অবস্থান অনুসারে স্থির করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বাসনার উচ্চস্তর হইতে সমুত্থিত কবিচিত্ত কাব্যে পৌঁছিলে যে বিলাসচক্রের উৎপত্তি হয়, তাহা বাসনার নিম্নস্তরসমুত্থ চক্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে।

বিলাসচক্র সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল কল্পনানন্দচক্র সম্বন্ধেও সেই কথা সম্পূর্ণ খাটে এবং রসচক্র সম্বন্ধেও না খাটিবার কথা নহে। রস বলিতে যতই লোকোত্তর ব্যাপারে সূচিত হউক, রসোত্তীর্ণ কাব্যেও হাস্যরস ও করুণরসে গভীরতার পার্থক্য আছে স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং রসোত্তীর্ণ কাব্যমাত্রই একই রসচক্র উৎপাদন করে না। ভাবের প্রকৃতি ও কবিপ্রতিভার পার্থক্য অনুসারে রসচক্র বিভিন্ন হয়। কেবল ইহাদের

মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম এই, যে কবিচিত্ত কাব্যে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেই সেই রসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। ইহা ছাড়া ভাবলোক, বাসনালোক, ও কল্পনালোকের সীমান্ত হইতে চক্রের উদ্ভব হইতে পারে এবং সে-সব ক্ষেত্রে চক্র 'মিশ্র চক্রে' পরিণত হয়। এমন কাব্য আছে যাহার চক্র অংশতঃ ভাববিলাস ও অংশতঃ বাসনাবিলাস; অথবা অংশতঃ বাসনাবিলাস ও অংশতঃ কল্পনানন্দ হইতে পারে। এ সমস্ত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে কবিপ্রতিভা কত বিচিত্র এবং তাহার পূর্ণ পরিচয় ও শ্রেণী বিভাগ করা কত দুঃসাধ্য, তাহা কল্পিত রেখাচিত্র হইতেই বেশ স্পষ্ট হইতেছে।

ইহাও বলা সঙ্গত যে, অধিকাংশ কাব্যই মিশ্র চক্রের উৎপাদন করে। কাব্যের যে চারিটী বিভাগ করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে কাব্যাংশের পক্ষে ঐ কথা সত্য হইলেও কোনও কাব্যে তাহার সমস্ত অংশ একই চক্রের উৎপাদন না করিতে পারে। তবে যে কাব্য ভাবপ্রধান তাহাকে ভাবসমুখ, যাহা বাসনাপ্রধান তাহাকে বাসনা-সমুখ, যাহা কল্পনাপ্রধান তাহাকে কল্পনাসমুখ এবং যে কাব্যে মুখ্য ভাবটী রস অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, গৌণ কাব্য-কৌশলে অল্পাধিক বিচ্যুতি থাকিলেও, তাহাকেই রসোত্তীর্ণ কাব্য বলিতে হইবে।

এইখানে শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায় আলোচনা করা যাইতে পারে। শিশুর মনে ত বাসনার বিশেষ বালাই নাই, কারণ সে জগতে ভাবের সহিত পরিচয় লাভ করিতেছে মাত্র, ভাবের স্মৃতি তাহার চিত্তে এখনও সঞ্চিত হইয়া উঠে নাই। যে পাঠকচিত্তে বাসনা নাই তাহা কাব্যক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না। সুতরাং কোন কাব্যের আস্বাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তবে শিশুকাব্যের সহিত শিশু-পাঠকচিত্তের অয়নচক্র কিরূপে সম্পূর্ণ হয় এবং আনন্দই বা কি উপায়ে উৎপাদিত হয়?

শিশুসাহিত্য

এখানে আমাদের বিচার করিতে হইবে শিশুসাহিত্য কোন্ 'ভাবের' কারবার করে। শিশুসাহিত্যের কারবার প্রধানতঃ বিস্ময় ও কৌতূহল ভাব লইয়া। বিস্ময় ও কৌতূহল এমন শ্রেণীর 'ভাব' যাহা বাসনার অভাবই সূচিত করে। বিস্ময় বা কৌতূহল ভাবোদ্বোধক বস্তুর পুনঃ পুনঃ সংঘাতে মনে বিস্ময় বা কৌতূহলের লাঘবই ঘটায়। যে চিত্ত জীবনে যত বেশী বার বিস্মিত হইয়াছে, তাহার বিস্মিত হইবার শক্তি তত কমিয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর ভাবের স্মৃতি যাহার চিত্তে যত কম সে ইহার উপভোগে তত বেশী অধিকারী। অতএব বিস্ময় বা কৌতূহল ভাবের স্মৃতির অভাবকেই এই ভাবের বাসনা বলা যাইতে পারে এবং সেই জন্যই শিশুপাঠকচিত্ত কৌতূহল ভাবলোক হইতে শিশু-কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হইবার অনধিকারী নহে।

শিশুসাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিচিত্তধারা ভাব ও বাসনালোকের সীমান্তপ্রদেশ হইতেই কাব্যক্ষেত্রে যাত্রা করে বলিয়া মনে হয়। বাসনা ও কল্পনা দ্বারা পরিপুষ্ট কবিচিত্ত হইতে উদ্‌গত শিশুসাহিত্য কোন দিনই শিশুপাঠকচিত্তের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই, বরং তাহাদের পিতাদের আনন্দ দিয়াছে ইহার উদাহরণ প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কবিতাপুস্তকের অনেক কবিতাই ইহার সমর্থন করিবে।

খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
"ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে।
ছিলি আমার পুতুল খেলায়,
ভোরে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গ'ড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে
তারি পূজায় তোমার পূজা করেছি।"

ইহার সমতুল্য কবিতা মোটেই সুলভ নহে। কিন্তু এখানে শিশু শিশু নয়, মা মা নয় এবং কাব্য শিশুকাব্য নহে। যে কবিচিত্ত শিশু না হইয়াও ভাব ও বাসনার সীমান্ত

দেশে বাস করিতে জানে, তাহাই শিশুকাব্য রচনা করিবার উপযোগী। আমাদের পুরাতন ছড়ার সহিত আধুনিক শিশুকাব্যের তুলনা করিলেই একথা স্পষ্ট হইবে। অখ্যাত-নামা ছড়ার কবিগণ এখনকার নামজাদা শিশুকাব্য-লেখক-গণের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বোকা সাজিয়া কাব্য রচনা করিত বলিয়া মনে হয় না। তাহারা বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শিশুর ন্যায় সরল ও কৌতূহলী ছিল, অথবা সময়ে সময়ে শিশু হই-বার দুর্লভ ক্ষমতা তাহাদের ছিল - যেমন স্নেহাতুরা জননী শিশুর সহিত শিশু হইয়া (কল্পনাবলে নহে) নিরর্থক শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া সার্থক শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। ঘরে ঘরে জননীরা শিশু সন্তানের মুখ চাহিয়া যে প্রলাপোক্তি করেন তাহার সুনির্ব্বাচিত চয়নিকা করিতে পারিলে হয়ত পূর্ব্বপ্রচলিত ছড়ার সমকক্ষ আধুনিক শিশু-সাহিত্য প্রকাশিত হইতে পারে। একটী নমুনা লইয়া বিচার করা যাক্।

ওপারে রে জন্তী গাছটী, জন্তী বড় ফলে,
গোজন্তীর মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে।
প্রাণ করে আইঢাই, গলা করে কাঠ,
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ?
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান,
পান কিনলাম চূণ কিনলাম ননদেভেজে খেলাম।

একটী পান কম হ'ল দাদাকে ব'লে দেবো,
দাদা দাদা ডাক পাড়ি, দাদা নেই ঘরে,
সুবল সুবল ডাক পাড়ি সুবল আছে ঘরে।
আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে,
সুবলকে নিয়ে যায় দিগ্‌নগর দিয়ে।
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেচে,
চিকণ চিকণ চুলগুলি ঝাড়্‌তে লেগেচে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেচে,
একটী নিলেন গুরুঠাকুর, একটী নিলেন টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে,
গায়ে হলুদ দিয়ে,
গৌরী বেটী কনে,
নকা বেটা বর,
ঝাম্‌কুড়াকুড়্‌ বাদ্যি বাজে, চড়কডাঙ্গায় ঘর।

এই ছড়ার অন্তরে কবিচিত্তধারার অনুসরণ করিলে দেখা যায়, কবিচিত্তের বয়স বেশী নয় এবং তাহা একটী অর্দ্ধস্ফুট বালিকাচিত্ত। তাহা না হইলে একটী পানের জন্য দাদার কাছে নালিশ করিতে ছুটিত না এবং পরক্ষণেই সুবলের বিবাহ-ব্যাপারে অমন মশ্‌গুল হইয়া যাইত না। জন্তীগাছ হয়ত আছে, কিন্তু 'গোজন্তীর মাথা' কেহ কস্মিন্ কালে দ্যাখে নাই, সুতরাং ইহার ভাবস্মৃতি বা বাসনা কবিচিত্তে সঞ্চিত নাই। অন্যবিধ গাছের মাথা, যাহা খাইয়া

'প্রাণ কেমন' করিতে পারে অথবা 'গলা কাঠ' হইয়া আসে (যেমন তামাক পাতা) তাহারই অর্দ্ধস্ফুট বাসনা কবিচিত্তে ভাব ও বাসনার সীমান্ত-প্রদেশে হয়ত অবস্থান করিতেছিল, সেইখান হইতেই কবিচিত্ত সরাসরি কাব্য-ক্ষেত্রে উঠিতে চাহিতেছে। চূণ দিয়া পান খাওয়ার বাসনা কবিচিত্তে প্রস্ফুট, কিন্তু বিবাহ হইলেও তৎসম্পর্কীয় ভাব পরিপাক হইয়া এখনও বাসনা-লোকে বেশ ভিত গাড়ে নাই বলিয়াই মনে হয়। দিগ্‌নগর, কাৎলা মাছ, চিকণ চিকণ চুল, ইহাদের বাসনা স্পষ্ট হইয়াছে, কিন্তু টিয়ের মা'র বিয়ে বিস্ময়ভাবের কথা এবং ইহার অভাবই বিস্ময়বাসনার রূপ। 'ঝাম্‌কুড়াকুড়্‌বাদ্যি' বাসনার নিম্নস্তরের কথা, কারণ এই বাদ্যি-ভাবের স্মৃতি বা বাসনা যখন মানব-চিত্তে বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন তাহা আর কাব্য-গঠনোপযোগী উপাদান থাকে না, তাহাকে থামাইবার জন্যই চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে— কবিচিত্ত এ ছড়ায় কখনও ভাব-লোকে এবং কখনও বাসনা লোকে অর্থাৎ তাহাদের সীমান্তপ্রদেশে বিচরণ করিতেছে।

শিশুপাঠকচিত্তধারার অনুসরণ করিলে দেখিব—জন্তীগাছ, গোজন্তীর মাথা, প্রাণ কেমন, হরগৌরীর মাঠ, পাকা পাকা পান, ননদভাজে তাহার ভক্ষণ ইত্যাদি সমস্তই তাহার পক্ষে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুতরাং কৌতূহলের বস্তু। পাঠকচিত্ত

এখানে অভাবাত্মক কৌতূহলবাসনার মধ্য দিয়া কাব্যে ছুটিয়াছে। এ চিত্ত জগতে ভাবের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া বাসনাসঞ্চয়ে সতত উন্মুখ, সুতরাং অংশতঃ ভাবমুখী অংশতঃ বাসনামুখী অর্থাৎ ভাবলোক ও বাসনালোকের সীমান্তপ্রদেশে পৌঁছিবার জন্য ইহার টান বেশী। অতএব কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের অয়নচক্র সম্পূর্ণ হইয়া এখানে আনন্দ অর্থাৎ বিলাস উৎপাদিত হইতেছে।

এ ছড়া হিসাবী লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক হিসাব ভুলিয়া লিখিতে পারে না, যেমন সাঁতার-জানা লোক ইচ্ছা করিলেও সাঁতার ভুলিয়া ডুবিয়া মরিতে পারে না। এ কাব্য শিশুমনে যতই উপভোগ্য হউক, কাব্যবিচারে ইহার আনন্দ বা বিলাস নিম্ন স্তরের, ইহাতে মতভেদ হইবার কারণ নাই। শিশু-সাহিত্য বলিতে আমি বালক-সাহিত্য বলি নাই এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

যদি এমন কথা বলা হয় যে শিশুচিত্ত ছড়ারূপ শিশু-সাহিত্য হইতে যে আনন্দ লাভ করে তাহা সম্পূর্ণরূপে সুর-জাত, ছড়ার কথা হইতে সে কোন আনন্দ পায় না, তবে আমার যুক্তি-পরম্পরা অসত্য না হইলেও নিষ্প্রয়োজন বলিতে হইবে।

অতএব দেখা গেল—কবিচিত্তধারা ও পাঠকচিত্তধারার অয়নচক্র সম্পূর্ণ হইলেই কাব্যোপলব্ধি সম্ভব হয় এবং তাহাতে বিলাসচক্র, আনন্দচক্র, রসচক্র বা মিশ্রচক্র অবলম্বন করিয়া এই চারিশ্রেণীর যে-কোন এক শ্রেণীর আনন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত

এইবার কয়েকটী দৃষ্টান্ত-সাহায্যে আমাদের কাব্যের শ্রেণীবিভাগ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং তাহারই অনুসঙ্গে কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের অপরাপর বিশেষত্বের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে।

খাঁটি ভাবসমুখ কাব্যের উদাহরণ দেওয়া কঠিন ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এই শ্রেণীর কাব্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিবার চেষ্টা করিয়াছি। হেমচন্দ্রের 'রেল গাড়ী' কবিতার আনন্দ নিশ্চয়ই বিলাসচক্রের অন্তর্ভুক্ত; তবে তাহাতে ভাববিলাসের সহিত বাসনা-বিলাসের যোগ আছে। ভাবসমুখ কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক না বলিলেও চলিবে।

ভাবসমুখ কাব্য

বাসনাসমুখ কাব্যের দৃষ্টান্ত সুলভ। বিদ্যাসুন্দরের কতক অংশ রতিবাসনাসঞ্জাত এবং তাহার আনন্দ রতি-বাসনাবিলাস মাত্র, যদিও তাহাতে ছন্দ, অলঙ্কার ও ব্যঞ্জনার অভাব নাই। যে পাকশালে রতিবাসনা পাক হইয়া মধুর রসে পরিণত হয়, সেখানে এ কাব্য পৌছে নাই বলিয়া রসোন্মুখী ও কল্পনামুখী পাঠকচিত্ত ইহাকে অশ্লীল বলিয়া আসিতেছে।

বাসনাসমুখ কাব্য

ঈশ্বর গুপ্ত 'তপ্‌সে মাছে' লিখিয়াছেন—

প্রাণে নাহি দেরী সয় কাঁটা আঁস বাচা,
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা।
কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা,
টপাটপ্ খেয়ে ফেলি ছাঁকা তেলে ভাজা।

ইহা লোভবাসনাসমুখ এবং ইহাব আনন্দ লোভবাসনা-বিলাস। লোভ-ভাবের ইহা একটী 'অশ্লীল' কবিতা। হাস্য-রসের কবিতা ইহা নহে।

হেমচন্দ্রের সুপরিচিত কবিতা 'অশোকতরু' বাসনাসমুখ কাব্যেরই উদাহরণ স্থল।

কে তোমারে তরুবর কোরে এত মনোহর
রাখিল এ ধরাতলে ধরা ধন্য কোরে
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে?
দেখ দেখ কি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ থরে থর
বিরাজে শাখার পর সদা হাস্যভরে
সিন্দুরের ঝারা যেন বিটপী উপরে।

ইহাতে অশোকতরুর যে শোভা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অশোকতরু-দর্শনের সাধারণ ভাবস্মৃতি মাত্র, কল্পনালোকে তাহা জারিত হয় নাই। তাহার পর কবিচিত্ত স্বকীয় ও মানব সাধারণের দুঃখের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও দুঃখের ভাবস্মৃতি বা বাসনামাত্র। তাহা কল্পনাসমৃদ্ধ নহে। সর্ব্বশেষে যখন বলিতেছেন—

এ দোষ কাহারও নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমার অন্তর হায় কলঙ্কেতে ভরা,
আমি তরু বড় পাপী তাই ঠেলে তারা।—

তখন ইহা নিতান্তই মন্তব্যের মত শোনায়। কলঙ্কময়, পাপী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কবিচিত্তের ভাব কোনরূপ বিভাব অনুভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা পর্যান্ত কবিতায় নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি লতা নিজে মেরুদণ্ডহীন হইলেও দণ্ড ও মঞ্চের সাহায্যে উচ্চে উঠিয়া গো-মহিষাদির মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এবং ফল ফলাইতেও সক্ষম হয়। অনেক বাসনাসমুখ কাব্য মধুর ছন্দ, চতুর অলঙ্কার ও সবল রীতির আশ্রয়ে বাঁচিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন—

এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে,
কমল চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া নিতল রসে
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে,
আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে।
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

এস তুমি যমুনার বনে দুকূল বুলাবে,
কোল দিয়ে ঐ কেলিকদম মুকুল খুলাবে,

বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা রং মেঘের মায়া
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙিন গুলাবে।
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে।

তখন কবিচিত্ত কল্পনার অভিনয় করিলেও কবিতা বাসনা-সমুখের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। বর্ষায় দুটি প্রাণীর দোল খাইবার সাধারণ ভাবস্মৃতি হইতে ইহার সম্ভব এবং সেই স্থানেই ইহার শেষ। সেই বাসনাও আবার এলোমেলো কল্পনার ভেজালে একেবারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দেবেন্দ্র সেন যেখানে বাজাইতেছেন—

ঝমর্ ঝমাং ঝম্ ঝমর্ ঝমাং ঝম্ বাজে ওই মল,

কিম্বা গোবিন্দদাস যখন ডাকিতেছেন—

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা।

তখনও কবিচিত্ত বাসনালোক ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ সব কবিতা কেবল ছন্দ, অলঙ্কার ও রীতির সাহায্যে বাঁচিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ কণিকার মধ্যে বলিতেছেন—

কুড়ালি কহিল, ভিক্ষা মাগি আমি শাল,
হাতল নাহিক, দাও একখানি ডাল।
ডাল নিয়ে হাতল্ প্রস্তুত হ'ল যেই
তারপরে ভিক্ষুকের চাওয়া চিন্তা নেই

একেবারে গোড়া ঘেঁসে লাগাইল কোপ,
শাল বেচারীর হ'ল আদি অন্ত লোপ।

ইহাতে বুদ্ধির পরিচয় অলঙ্কারের কৌশল আছে, কিন্তু কবিচিত্ত বাসনার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; মাত্র চতুরতার সাহায্যে আনন্দ-সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। ইহাও বিলাসচক্রের অন্তর্গত। তবে এ কবিতা উত্তম কবি-প্রতিভার লীলামাত্র—অক্ষমতা নহে।

উত্তম কবিপ্রতিভার পক্ষে নিম্নস্তরে লীলা করা অসম্ভব নহে। চিত্রে দেখা যায় রসোন্মুখী কবিচিত্তের গতিপথে বাসনাচক্র ও আনন্দচক্র পড়ে। সুতরাং খেয়াল হইলে সে রসে না উঠিয়া মধ্যে মধ্যে ভাব, বাসনা বা কল্পনা হইতে কাব্যে চলিয়া যাইতে পারে। আবার উচ্চচক্রের অধিকারী পাঠকচিত্তের পক্ষেও বাসনাচক্রে ভ্রমণ করা অসম্ভব নয়। রসোন্মুখী পাঠকচিত্তের পথে বিলাসচক্র পড়ে এবং খেয়ালের বশে সে কাব্য হইতে সিধা ভাব বা বাসনায় নামিয়া আসিতে পারে। এইজন্যই রসোন্মুখী পাঠকচিত্তও কখন কখন নিম্নস্তরের কাব্যে বিলাস করিতেছে দেখা যায়, যেমন রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তও মধ্যে মধ্যে ভাব ও বাসনাস্তর হইতে কাব্য উৎপাদিত করিতেছে দেখা যায়।

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবমুখী বা বাসনামুখী চিত্তের পক্ষে আনন্দচক্র বা রসচক্রে ভ্রমণ সম্ভবপর নহে। বিলাসচক্র ও

আনন্দচক্র বৃহত্তর রসচক্রের অন্তঃস্থিত সুতরাং রসচক্রের অধিকারীর ক্ষুদ্রতর চক্রেও অধিকার আছে। আর বৃহত্তর চক্র ক্ষুদ্রতর চক্রের বহিঃস্থিত হওয়ায় ভাবমুখী বা বাসনামুখী পাঠকচিত্তের পক্ষে কল্পনানন্দ বা রস লাভ করা সম্ভব হয় না। রেলপথে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া খেয়াল হইলে যে কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ করা চলে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটধারীর পক্ষে অন্য কোন শ্রেণীতে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। গঙ্গোত্রী-স্নানার্থী যাত্রীর পক্ষে হরিদ্বারের টিকিট কেনা থাকিলে, রাবড়ির লোভে একদিন কাশীবাস করিয়া, ঠুংরি শুনিতে দুই দিন লক্ষ্ণৌএ থাকিয়া, জ্যোৎস্নারাত্রে তাজ দেখিবার মানসে আগরায় নামিয়া, পরে নির্দ্দিষ্ট পুণ্যদিনে হরিদ্বারে পৌঁছিয়া গঙ্গাস্নানে বাধা নাই। কিন্তু যে লিলুয়ার টিকিট কাটিয়াছে তাহার পক্ষে ঐ সমস্তই নিষিদ্ধ; আর কাশীর টিকিটেও আগরার তাজ দেখা যায় না।

সুতরাং চিত্র ও যুক্তির সাহায্যে বুঝা গেল উত্তম শ্রেণীর কবিচিত্ত কিরূপে সময়ে সময়ে অতি নিম্নস্তরের কবিতা লিখে এবং অতিশয় রসিক পাঠকচিত্তও কি-ভাবে তথা-কথিত অশ্লীল কাব্যের 'রস' গ্রহণে সমর্থ হয়।

কল্পনাসমুখ কাব্যের সাধারণ লক্ষণ পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি। এই শ্রেণীর কাব্যে স্বল্পাধিক মাত্রায় কাব্যের অধিকাংশ গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা প্রকৃত রস উদ্রেক

করিতে পারে না, কারণ কবিচিত্ত এ স্থানে রস উত্তীর্ণ হইয়া কল্পনাসমুখ কাব্যে পৌঁছে নাই। অথচ কবিচিত্ত রস কাব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকায় রসলোকে উঠিবার পুনঃপুনঃ প্রয়াস করে, যে প্রয়াস অধিকাংশ সময় কাব্যেও প্রকট হইয়া উঠে। সেই রসহীন আয়াসের ফলে ছন্দ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতির মাত্রাজ্ঞান কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে।

কবি গোবিন্দদাসের 'আমার ভালবাসা' কবিতাটি লইয়া বিচার করিলে এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হইতে পারে। কবি আরম্ভ করিলেন :—

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
... ...
বুঝিনা আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেমকথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝিনা সে উপভোগ,
অদেহী আত্মারে আগে কি'স ছুঁয়ে লহ ?

কবির চিত্তধারা নারী এই বস্তু হইতে রতিভাব ও রতিবাসনায় উঠিয়া সেই ভাবের যে বিশেষ রূপটিকে মধুর রসে পরিণত করিতে চায় তাহা এই,—রমণীর রূপ ও প্রেম

অভিন্ন ও অচ্ছেন্ত; রূপব্যতিরিক্ত প্রেমের অস্তিত্ব নাই; প্রেম আসলে রূপপ্রধান ব্যাপার। কবিচিত্ত এখানে এমন একটি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়াছে যাহার বাসনা দৃঢ়। তাহার পর উপযোগী শব্দ, বলিষ্ঠ রীতি ও বিবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ে একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ—
ও কর্দ্দমে ওই পঙ্কে
ওই ক্লেদে ও কলঙ্কে
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।

কলঙ্ক, ক্লেদ, পঙ্ক এ সমস্ত অলঙ্কার মাত্র। কবির বক্তব্য—নারীদেহের রূপ, লাবণ্য, স্পর্শ, আস্বাদ এই সমস্ত দেহসাহায্যে নিবিড়ভাবে উপভোগ করা। বক্তব্য বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও কল্পনালোকে কবিচিত্তের লীলা ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু কবিচিত্ত এখানে জানে—এই ভাবটিকে যতক্ষণ রসে পরিণত করিতে না পারিতেছে ততক্ষণ তাহার মূল্য কম এবং সে এখনও রসলোকে উঠিতে পারে নাই। তখন নূতন বিভাব অনুভাব উপভাবের সাহায্যে সে রসলোকে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের কেলিভরে
পৃথিবী উলটি পড়ে,
ও নহে সাগরে বান, তোমরা যা কহ।
মর্দ্দনে মন্থনে বুকে,
অগ্নি উঠে গিরিমুখে,
ভূমিকম্পে কাঁপে বিশ্ব ভয়ে অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

আরম্ভ হইয়াছিল—লৌকিক পুরুষচিত্ত লৌকিক রমণী-দেহকে যেরূপে সাধারণতঃ ভোগ করে তাহারই কথায়, কবির বক্তব্যও তাহাই। কিন্তু কবিচিত্ত কল্পনালোকে উঠিয়া দেখিল, সাধারণ বিভাব অনুভাব লইয়া সে ইহাকে রসলোকে উঠাইতে পারিল না; তখন ব্যাপারটাকে একেবারে দেহাতীত, রূপাতীত, universal করিবার কৌশল অবলম্বন করিল, যদি তাহাতেই ভাবটি রসে পরিণত হয়। কবিকল্পনা ক্রমে একেবারে বল্গা ছাড়িয়া দিল—

এস সুধা এস বিষ,
এস পুষ্প কি কুলিশ,
এস অগ্নি এস জল এস গন্ধবহ।

কবিচিত্তের একাগ্র আহ্বানে ও বলিবার বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সমস্তই হয়ত আসিয়াছে, কিন্তু রস আসিতেছে না অর্থাৎ তাহার উদ্দিষ্ট ভাবটী রসে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না।

তখন আবার নিজের বক্তব্য বিষয়ে সোজা নামিয়া গিয়া অন্য উপায়ে চেষ্টা করিতেছে—

চোখে চোখে চোখ খোঁজা
হাতায়ে পীরিতি খোঁজা,
তার চেয়ে এ যে সোজা চোখে দেখে নহ।
সে আমার আমি তার,
নাহিক বাকল সার,
এক আত্মা দুজনার অনাদি আবহ।
আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

কুশলী কবিচিত্ত তাহার এই রসলোকে উঠিবার প্রয়াস কাব্যে যাহাতে প্রকট না হয় সে চেষ্টা যথারীতি করিয়াছে এবং সে বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্যও হইয়াছে। কিন্তু ফলে কি হইল? আরম্ভ হইয়াছিল

আত্মায় আত্মায় যোগ
বুঝিনা সে উপভোগ—

এই ভাবটিকে রসমূর্তি দিবার পরিকল্পনায়, আর সমাপ্তি হইল

এক আত্মা দুজনার
অনাদি আবহ!

'আত্মায় আত্মায় যোগ' চিরপ্রসিদ্ধ এই ভাবটীকে শ্লেষ করিয়া যাহার আরম্ভ, সেই ভাবটিকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিপন্ন

করিয়া কবিতা প্রায় শেষ হইল। তাহার পর যাহা হইতেছে তাহা দেহের রূপাত্মক ভোগকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া "আত্মায় আত্মায় যোগ"এর ভোগকেই অর্ঘ্যদান।

সুন্দর কুৎসিত হোক,
উলঙ্গ আবৃত রোক,
কুরুচি বলিয়া কর কলঙ্ক নিগ্রহ,
থাক্ তার মহাকুষ্ঠ
আমি যে তাতেই তুষ্ট,
তোমরা দেখ না, নয় ভয়ে দূরে রহ।
চন্দন আতর সম
তার পূঁজ প্রিয় মম,
শরীরে মাখিলে যায় যাতনা দুঃসহ।

"আত্মায় আত্মায় যোগই প্রেম" এই ভাবটীর অনুভাব পূর্ব্বোদ্ধৃত কাব্যাংশে যেমন চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে এমন খুব কম দেখা যায়। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য ছিল ইহার বিপরীত ভাবটীকে রসে পরিণত করা। কবিপ্রতিভা এক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যথেষ্ট শক্তির অভাবে কবিচিত্তকে রসলোকে উত্তীর্ণ করিতে পারিল না; পরস্পর-বিরোধী বিভাব অনুভাবের জালে জড়াইয়া কাব্যে আসিয়া পৌঁছিল। কবিচিত্ত নিজে রস ঘুরিয়া কাব্যে আসে নাই বলিয়াই চেষ্টা-চিহ্ন বুদ্ধিগোচর হইতেছে এবং যথেষ্ট নিপুণতা

সত্ত্বেও তাহার চিন্তা ও চেষ্টা উদ্দিষ্ট রসের অনুগত হয় নাই। কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হইলে কবিতার প্রথম দুইটি ছত্র এমন পরস্পর-বিরোধী হইতে পারিত না।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ।

অস্থিমাংসময় দেহের পরস্পর বিচ্ছেদেরই অপর নাম 'বিরহ'। বিরহে অস্থিমাংস কে কোথায় পায়? বিরহ যখন অমৃত হয় তখন আত্মায় আত্মায় যোগের বাকী থাকে কি?

কল্পনাসমুখ কাব্যের অনেক কথা এই আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে। এ কবিতা বাসনাসমুখ বলিতে পারি না; কারণ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে ইহার বিভাব অনুভাব উপভাব ভাবোপযোগী, ইহার প্রত্যেক ছত্রে কবিচিত্তের ছাপ পড়িয়াছে, ইহার প্রতীতি দৃঢ়, রীতি বলিষ্ঠ, গতি সাবলীল, অলঙ্কার সুন্দর, অর্থ সুস্পষ্ট। অর্থসম্পর্কে বলিতে হয় যে সমগ্র কবিতার কোন অর্থ হয়ই না, ইহা আমার বক্তব্য নহে। আমি বলিতে চাই, ইহার মূলভাব রসে রূপান্তরিত হয় নাই বলিয়াই এক অংশের সহিত অপরাংশের অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং বুঝা যায় কবিচিত্ত এ কাব্যে রসোত্তীর্ণ নহে।

উচ্চস্তরের কল্পনাসমুখ কাব্যে কবি-প্রতিভা অনেক সময় সমগ্র কাব্যের মূল ভাবটীকে রসে রূপান্তরিত করিতে

না পারিলেও কাব্যাংশে প্রকাশিত সঞ্চারী ভাবকে রসায়িত করিতে সক্ষম হয়। রসে পৌঁছিবার চেষ্টার মধ্যেও আনন্দ আছে, যদিও সে আনন্দের প্রকৃতি ও গভীরতা রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রের পথে যাতায়াত-জনিত আনন্দের প্রকৃতি ও গভীরতা হইতে বিভিন্ন। কবি-প্রতিভা রসে উঠিবার এই সানন্দ প্রযত্নদ্বারা মধ্যে মধ্যে রসলোক স্পর্শ করিয়া আসে এবং তাহারই ফলে কাব্যাংশ হীরার টুক্‌রার ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করে, যদিও সমগ্র কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দহিন্দোল' কবিতাটী লইয়া বিচার করা যাইতে পারে।

মেঘলা থম্ থম্ সূর্য্য ইন্দু
ডুব্‌ল বাদলায়, দুল্‌ল সিন্ধু!
হেম-কদম্বে তৃণস্তম্বে
ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু।

মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন,
মেঘসমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন।
দগ্ধদৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির
মুগ্ধনেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

—এ কাব্যে কবি-চিত্ত ঘনায়মান বর্ষার একটী বিশেষ ভাবকে রসমূর্ত্তি দিতে চাহিতেছে। এই ভাবটীকে বর্ষার "হিন্দোল ভাব" বলা যাইতে পারে। বর্ষার সাধারণ ভাবের

বাসনা কবিচিত্তে স্পষ্ট; কিন্তু "হিন্দোল ভাব"এর বাসনা অস্পষ্ট। বাসনা-স্তরে যাহা অস্পষ্ট, কল্পনার মায়ালোকে তাহা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। দেখা যায় কবিচিত্ত প্রথমে বর্ষার এই হিন্দোল ভাবকে ধরিবার প্রয়াস করিতেছে। যখন থম্ থম্ মেঘাচ্ছন্ন অস্তমিত সূর্য্য-চন্দ্রের নীচে সিন্ধু দুলিতেছে, তখন কদম ফুলের ও ঘাসের চোখে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিতেছে। এদিকে অতি ক্ষুদ্র খঞ্জন পাখী নীরবে নৃত্য করিতেছে, ওদিকে মেঘসমুদ্রে মন্থন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যবধানাত্মক বিভাবের দোলা দিয়া তিনি হিন্দোল ভাবটীকে রসে তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পরের শ্লোকে এ দোলা প্রায় থামিয়া গেল—

ভাস্‌ছে বিল খাল, ভাস্‌ছে বিলকুল্!
ঝাপ্‌সা ঝাপটায় হাস্‌ছে জুঁইফুল,
ধান্য শিষ্ তার কাছে বিস্তার
তলিয়ে বন্যায় জাগ্‌ছে জুলজুল্।

ইহা বর্ষার সাধারণ ভাবের বিভাব; দোলার বিভাব নাই বা একান্ত অস্পষ্ট।

বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্রকম্বু
কাঁপ্‌ছে অম্বর কাঁপ্‌ছে অম্বু।

লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্ছে ঝঙ্কার
"ওম্ স্বয়ম্ভ" "ওম্ স্বয়ম্ভ"!
ঝর্ছে ঝর্‌ঝর্ ঝর্ছে ঝম্‌ঝম্
বজ্র গর্জ্জায়, ঝঞ্ঝা গম্ গম্
লিখ্ছে বিদ্যুৎ মন্ত্র অদ্ভুত,
বল্‌ছে তিনলোক বম্ ববম্ বম্।

বর্ষার সাধারণ ভাবের চমৎকার বিভাব, কিন্তু কবিচিত্ত তাহার হিন্দোল ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে অথবা তাহা লইয়া বিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের শ্লোকটীর সহিত তুলনা করিলে এই দুই শ্লোকের বিভাবে অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্তু এখানেও সেই ব্যবধানাত্মক কৌশল অবলম্বনে হিন্দোল ভাবটীকে রসমূর্ত্তি দেওয়ার প্রয়াস। তবুও যে হিন্দোল ভাব পাঠকচিত্তে মূর্ত্তি পাইতেছে না তাহার কারণ—একবার নিম্নতম মধ্যবিন্দু এবং পরক্ষণে, অথবা কিয়ৎক্ষণ পরে, শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের বর্ণনা করিলেই দোলার সব কথা বলা হয় না। এই বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ওঠানামার বিচিত্র গতি, ভঙ্গী, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিভাব অনুভাব না থাকিলে ছন্দ নাচিয়া চলিলেও অর্থ দুলিয়া উঠে না। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি, তাহা রবীন্দ্রনাথের ঝুলন বা মরণ-দোলার অংশবিশেষ পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে।

দুলিছ গো দোলা দিতেছ,
পলকে আলোকে তুলিয়া, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।
সমুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।

ছন্দ-হিন্দোলের কবিচিত্ত অবশেষে যখন—

সান্দ্র বর্ষণ হর্ষ-কল্লোল,
ঝিল্লীগুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল!

হইতে

মূর্চ্ছে বীণ আর মূর্চ্ছে বীণ্‌কার,
মূর্চ্ছে বর্ষার ছন্দহিন্দোল!—

এই অনুভাবটীর মধ্যে পড়িয়া গেল, তখন বর্ষার হিন্দোল-ভাবটী প্রকৃতই মূর্চ্ছাহত হইল। তাহার আর রসে উঠা সম্ভবপর হইল না। কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হইলে এরূপ হইতে পারিত না। কবিচিত্তকে এখানে উচ্চ স্তরের কল্পনা-সমুখ বলিলেও হয়ত আপত্তি না হইতে পাবে, কিন্তু তাহা রসোত্তীর্ণ নহে। বিভাব-পরম্পরায় যে পরিবেষ্টনী ফুটিয়া উঠিবে তাহা মূল রসের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন; আবার অনুভাবও রসানুগ হওয়া চাই। অনুভাব এবং বিভাব কার্য্যাকারণ সম্বন্ধযুক্ত। সান্দ্রবর্ষণ, হর্ষকল্লোল, ঝিল্লীগুঞ্জন,

মঞ্জু হিল্লোল, এই বিভাব হইতে 'বীণ, বীণ্‌কার ও বর্ষার ছন্দহিন্দোল'এর এক সঙ্গে মূর্চ্ছারূপ অনুভাব অস্বাভাবিক, অপ্রাসঙ্গিক। যদি একাব্যে কবিচিত্ত বর্ষার সাধারণ ভাবটীকে রসে পরিণত করিতে চাহিতেছে এমন হইত, তাহা হইলে শেষের কয়েকটী ছত্র আসিত না এবং কবিতাটী হয়ত রসোত্তীর্ণ কাব্যত্বের দাবী করিতে পারিত। কিন্তু কবিচিত্ত বর্ষার হিন্দোল ভাবকেই রসমূর্ত্তি দিতে চাহিয়াছিল, তাহার সাধারণ ভাবকে নহে। উদ্দিষ্ট ভাবের বাসনা কবিচিত্তে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট না থাকায় ভাব রসের স্তরে উঠিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার মধ্যে বর্ষার সাধারণ ভাব— যাহা একাব্যের পক্ষে সঞ্চারী ভাব—অনেক স্থলে রসলোক স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে;

বৃংগু থম্ থম্ গুরু গম্ভীর!

বর্ষায় মানব-মনের বিস্ময়-জড়তার ভাবটি এই বিভাব দ্বারা চমৎকার রসায়িত হইয়াছে। এখানে কাব্যাংশ আপনার উজ্জ্বলতায় আপনি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

একাব্যে রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত চমৎকার ছন্দের মধ্য হইতে রসের গন্ধ পাইয়া রসলোকে উঠিতে চাহে, আর পথের অভাবে কল্পনালোকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয় বলিয়া ক্ষুণ্ণ হয়, আনন্দ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কল্পনামুখী পাঠকচিত্তের সন্তুষ্ট হইবার পক্ষে বাধা হয় না।

এ কবিতায় প্রকৃত রসোদ্বোধ যে হইল না তাহার কারণ আমার মনে হয়—যে কবিচিত্তে এ ভাববিশেষের বাসনা ছিলই না বা একান্ত অস্পষ্ট ছিল। সাধারণ ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ইহার মূলেই কৃত্রিমতা ছিল।

এ কাব্যসম্পর্কে যদি বলা হয় যে ইহা 'ছন্দহিন্দোল' মাত্র, বর্ষার হিন্দোল ভাবকে রসমূর্ত্তি দিবার চেষ্টা বা অনুরূপ কোন প্রয়াস কবিচিত্তে ছিল না, তবে কবি ও কাব্যের মর্য্যাদা হানি করা হয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কাব্যের শেষে স্পষ্টই বলা হইয়াছে ইহা 'বর্ষার ছন্দহিন্দোল'।

কল্পনাসমুখ কাব্যের আর একটী প্রধান লক্ষণ এই দেখা যায় যে উদ্দিষ্ট ভাবটীর বাসনা কবিচিত্তে দৃঢ়প্রতীত না থাকায় নানা অবান্তর ভাব—যাহাদের বাসনা কবিচিত্তে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়—তাহাই আসিয়া জুটে।

কাব্যরসিকেরা সুন্দরী রাণীর অঙ্গশোভাব উপমা মাতঙ্গে ও গৃধিণীতেও পাইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা পবন-নন্দনের পার্থিবরূপ ভুলিয়া যদি তাহার রসরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি উক্তবিধ কল্পনাসমুখ কাব্যের সহিত বিশল্যকরণী আনিতে গন্ধমাদন আনার উপমাটী প্রয়োগ করিতে পারি। এ সব কাব্যগন্ধমাদনে লক্ষ ওষধির গন্ধে চিত্ত বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশল্যকরণীব সন্ধান মিলিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায় এবং সেই বিশল্যকরণীর রস

যখন মিলে তখন সংসার-বিষবৃক্ষের বিষশল্যাহত রসোন্মুখী পাঠকচিত্ত হইতে আগ্রহের শেষ রক্তবিন্দু নিঃসারিত হইয়া গিয়াছে, ওষধির রস তখন বিফল। কবিচিত্ত শক্তিশালী হইলেও, তাহাতে বিশল্যকরণী সম্পর্কে বাসনার অভাব ও অস্পষ্টতাই এ বিপত্তি ঘটায়। এরূপ কাব্যের দৃষ্টান্তের অভাব নাই এবং দিবার প্রয়োজন বোধ করি না।

রসোত্তীর্ণ কাব্য

রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে সানন্দ যাতায়াতের ফলে রসোত্তীর্ণ কাব্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এ কাব্যের প্রধান লক্ষণ এই যে কবিচিত্তের কোন আয়াস বা শ্রান্তির পরিচয় ইহাতে থাকে না। ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা সমস্তই রসানুগ হয়, কারণ রসসিক্ত কবিচিত্তের সংস্পর্শে তাহারা জন্মলাভ করিয়াছে। কবিচিত্ত এখানে রসসিক্ত হয় বলিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে তাহা নহে, বরঞ্চ উত্তম প্রতিভার লক্ষণই এই যে অন্তর হইতে রচনামৃত আহরণ করিয়া আনন্দলোক বিরচন করিবার সময় সে আত্মসম্বন্ধে বেশ সচেতন থাকে। কবিচিত্ত যদি আপনার সৃজনক্ষেত্রে আপনি ডুবিয়া যায় তবে তাহার সৃষ্টিশক্তি বা প্রতিভার দুর্ব্বলতাই সূচিত হয়। এমন কবিচিত্তের পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে পাই যাহা শক্তিশালী হইলেও আত্মসচেতনতার অভাবে সামর্থ্যোচিত কাব্যসৃষ্টি করিতে পারে নাই। আত্মসচেতন বলিতে ইহা

বুঝিব না যে আমরা যেমন কাব্যের বিভাব, অনুভাব, উপভাব বিশ্লেষণ করিয়া কাব্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, কবিচিত্ত সেই সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ চেতনা রাখিয়া কাব্য সৃষ্টি করে। রসোত্তীর্ণ কাব্যে এ সমস্ত ব্যাপার স্বতঃই রসানুগ হয়। আত্মসচেতন বলিতে ইহাই বুঝিব—রসলোক ও কাব্যক্ষেত্রে আনন্দময় যাতায়াতের সময় রসোত্তীর্ণ কবিচিত্ত কখনও ভুলিয়া যায় না যে তাহার উদ্দেশ্য রসকে ভোগ করা নহে, রসকে অপরের ভোগ্য করা; সে ভোক্তা নয়, সে স্রষ্টা; সে প্রজাপতি নহে, সে মধুমক্ষিকা; রসের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার আনন্দ তাহার নহে, রসসমুদ্র সন্তরণ করিয়া তাহাকে তীরে উঠিতে হইবে। মহাপ্রভুর চিত্ত রসসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল কারণ সে চিত্ত কবিচিত্ত ছিল না, প্রেমিকচিত্ত ছিল।

রসোত্তীর্ণ কাব্যে কবিচিত্তের আয়াসের কোন লক্ষণ থাকে না বলিয়াছি। তাই বলিয়া একথা সত্য নহে যে উৎকৃষ্ট কাব্যরচনায় কবিচিত্তের কোন প্রযত্ন থাকিবার প্রয়োজন হয় না, একবার রসলোক ঘুরিয়া আসিলেই তাহা নির্ঝরের মত স্বতঃ নিঃসারিত হইয়া চলে। রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে তাহার আয়াস অবশ্যম্ভাবী। কবিচিত্তধারা বস্তু হইতে বহুদূরে বহিয়া আসিয়াছে, আসিবার পথে বাসনা-বোঝাই কল্পনার

তরী টানিয়া আনিয়াছে, তাহাব উপর অনিবার ওঠা-নামা, জোয়ারভাঁটায় যাওয়া আসা;—শ্রম হইবার কথা বটে। কিন্তু সেই যাতায়াত যদি আনন্দমূলক ও আনন্দের কারণ-স্বরূপ হয়, তবে কবিচিত্তে আয়াস আব আয়াস থাকে না এবং কাব্যেও তাহা আনন্দরূপ গ্রহণ করে। অল্পায়াসে অন্তর হইতে বচন আহরণ,—কখনও হয়, কখনও হয় না। অন্তরের গহন রসকাননে কোথায় কোন ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধ ধরিয়া তাহাব সন্ধান কবিতে হইবে; বিবিধ কুসুমের বিচিত্র মধু আনিয়া কাব্যচক্রকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে; ইহা ত অনায়াসসাধ্য হইবার কথা নহে। এ কাজ যাহারা কবে তাহারা মধুপ্রিয় প্রজাপতি নহে, মধুচক্রের নির্ম্মাতা মধু-মক্ষিকা। মধুমক্ষিকা কোনদিন অলস বা আয়াসবিমুখ নহে। মধুমক্ষিকার পাখা যে ক্লান্ত হয় না, তাহার কারণ—সে জানে, মধু বহন করিতেছে; তাহার রচিত মধুচক্র যে সৃষ্টিকৌশলে অদ্বিতীয় হইয়াও সহজ-সুন্দর, তাহার কারণ মধুমক্ষিকা নিতান্ত নিপুণ, একান্ত নিরলস।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—রসলোক হইতে কাব্যক্ষেত্রে অনিবার যাতায়াতের ফলে যখন রসোত্তীর্ণ কাব্যের সৃজন হইতে থাকে, তখন কি কবিচিত্তকে কল্পনালোক, বাসনা-লোক বা ভাবলোকে আর উঠা-নামা করিতে হয় না? যে লোকে বাসনায়িত ভাব কল্পনার সাহায্যে রসরূপ গ্রহণ করে

তাহারই নাম রসলোক। কবিচিত্ত কোন ভাবসম্বন্ধে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত ভাবের বাসনা, কল্পনা ও রস তখন অভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ রসলোকে বসিয়াই কবিচিত্ত ঐ ভাবসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বাসনা ও তদুপযোগী কল্পনার যোগান পাইতেছে। নিপুণা গৃহিণী পাকশালে বসিয়াই যেমন রন্ধনোপকরণ প্রাপ্ত হন, হাঁড়ি চড়াইয়া হাটে বা শস্যক্ষেত্রে ছুটাছুটি যেমন হাস্যকর অব্যবস্থা মাত্র, তেমনি রসোত্তীর্ণ কবিচিত্তের পক্ষে রসলোকেই কাব্যের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকে, তাহাকে আর পুনঃপুনঃ বাসনা বা কল্পনালোকে ছুটাছুটি করিতে হয় না। কাব্যবিশেষের উদ্দিষ্ট ভাবসম্বন্ধে রসলোক কল্পনালোক বাসনালোক ও ভাবলোক তখন অভিন্ন ও একক্ষেত্রীভূত হইয়া থাকে।

এইবার রসোত্তীর্ণ কাব্যের দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথের 'চম্পা' কবিতাটিতে দেখা যায় কবিচিত্ত রস ঘুরিয়া কাব্যে পৌঁছিয়াছে।

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত,
রুদ্র তপস্যার বনে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জল স্থল--শূন্য, স্তব্ধ, বিহ্বল জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিযা না মরি,
উগ্র মদ্যসম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি',
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন, মুহুর্মুহু করি অনুভব!
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি',
দিনদেবে নমস্কার—আমি চম্পা সূর্য্যের সৌরভ।

যে কবিতা রসোত্তীর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহা কেন রসোত্তীর্ণ এ বিচার করা ঠিক সম্ভবপর নহে, সে চেষ্টা করিব না। সে কাব্য কেন ভাবসমুখ নহে, বাসনাসমুখ নহে, কল্পনাসমুখও নহে, তাহার বিচার হয়ত চলিতে পারে ; কিন্তু এ কবিতাটী লইয়া সেই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। নব-নিদাঘের খর সূর্য্যতাপে শূন্য শুষ্ক বিহ্বল জর্জ্জর অবণ্যানীর মধ্যে বসন্ত যখন মুমূর্ষু, তখন যে কুসুমবালা সাহসিকা অপ্সরার ন্যায় বিশ্বাসের বৃন্তে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে ফুটিয়া উঠিল, সাধারণ কুসুমের মত রৌদ্রের মদ্যপানে

বিহ্বল না হইয়া যে অনুভব করিল স্বর্গের অপ্সরার ন্যায়ই তাহার অঙ্গের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই কুসুম উষার কর ধরিয়া সূর্য্যের পানে মুখ তুলিয়া যখন বলিয়া উঠে, "আমি চম্পা সূর্য্যের সৌরভ"—তখন বিশ্লেষণ-বুদ্ধি তাহার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া নতজানু হইয়া সেই বিজয়িনীকে প্রণাম করে।

"আমার ভালবাসা" শীর্ষক কবিতায় যে-কবির চিত্ত কল্পনালোকে আপনার খেলায় আপনার খেই হারাইয়া ফেলিল, সেই কবির চিত্ত অপর একটী কাব্যে রসোত্তীর্ণ হওয়ায় কি অপরূপ রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গোবিন্দ দাসের "কস্তুরী"-কাব্যে "অতুল" শীর্ষক কবিতাটীর কথা বলিতেছি। বিধবা মায়ের একমাত্র শিশুপুত্র অতুল ছুটি-অন্তে মাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে নাই, তথাপি তাহাকে পাঠাইতে হইল। অতুল আর মায়ের কোলে ফিরিয়া আসে নাই। এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতার প্রতি পংক্তির বিভাব, অনুভাব যে কত দূর মূল রসের অনুগামী হইয়া চলিয়াছে তাহা সমগ্র কবিতাটী পাঠ না করিলে বুঝা যাইবে না। মাতৃহৃদয়ের যে অপরূপ বিয়োগব্যথা এই কবিতায় রসমূর্ত্তি পাইয়াছে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। অতুল বিদেশে যাইতেছে ;—

একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে।
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায় ;
গোধূলির কোল হ'তে রবি অস্ত যায়!

তাহার পর বাঙ্গালীর ঘরে আশ্বিন মাস আসিয়াছে ;—অতুল বাড়ী আসে নাই।

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাণ্ডালকোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হ'য়েছে বাহির।

কবিচিত্ত রসোত্তীর্ণ হওয়ায় মাতৃস্নেহ যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। করুণরসোপেত কবিচিত্তধারা জাহ্নবী ধারার ন্যায় সুদীর্ঘ বিচিত্র পথে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, আর অগ্রগামী মাতৃস্নেহের শঙ্খনিনাদ তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিপথগামী হইতে দিতেছে না। সমগ্র কবিতাটী উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। রসোত্তীর্ণ হইলে পরিচিত সাধারণ ভাব সাধারণ ছন্দেই কেমন অপরূপ কাব্যশ্রীমণ্ডিত হইতে পারে—এ কবিতা পাঠ করিলে তাহা বুঝা যাইবে। কবিচিত্ত দশমী রাতের বর্ণনা করিতেছে—

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর ;
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ-গহ্বর ;
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে।

এ বর্ণনা চন্দ্রহীন আকাশের বর্ণনা, না পুত্রহারা জননী-হৃদয়ের বর্ণনা—কে বলিবে ?

ভাবের বিশেষত্ব বা নূতনত্ব না থাকিলে কাব্য রসোত্তীর্ণ হইতে পারে না, এমন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। হেম-চন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কাব্যের প্রথম কবিতাটীতে দেখিতে পাই—কবিচিত্ত রসলোক ঘুরিয়া আসিলে সুপরিচিত ভাব হইতেই কেমন রসসৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।

দশমহাবিদ্যা কাব্যের প্রথমেই কবি সতীশূন্য কৈলাসে শিবের শোক বর্ণনা করিতেছেন—

সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিবার পর শিব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মাদের ন্যায় ত্রিজগৎ পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শনে সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী-ময় ছড়াইয়া দিলেন।—

ছিন্ন হইল সতীদেহ শূন্য হইল শিবগেহ
বামদেব বিরস-বদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন।

সতীমুখ-বিভাসিত, যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন,
পেয়ে যে কিরণমালা সুবর্ণ মণি উজলা,
সে আলোক নহে দরশন।
শুষ্ক কল্পতরুসারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোল সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগৎ-প্রাণ নিরুদ্ধ সৌরভ ঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহগ কূজন।
নন্দী শুয়ে রেণুপর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্রবাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর দূরে রাখি' বাঘাম্বর
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন।
... ...
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন,
করে জপমালা চলে মুখে বব বম্ বলে
অন্য শব্দ সকলি মলিন।
জলময় ফণিমালা মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা
লুকাইল জটার ভিতর,
নিস্পন্দ পবনস্বন নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণুপর।
থামিল গঙ্গার রব নির্ব্বাক প্রমথ সব
কৈলাস জগৎ অচেতন,
কদাচিৎ মা মা নাদে অসম্বিৎ নন্দী কাঁদে,
বম্ শব্দ সহ সম্মিলন।

কৈলাস অম্বরময় তারা সূর্য্য অভ্যুদয়
ক্ষণকালে নিবিল সকল,
তমঃচ্ছন্ন দিগাকাশ কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল।
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি' হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ,
পরশিতে পুনর্ব্বার সুকুমার তনু তার,
মমতার অভ্যাস যেমন।
তখন নয়ন ঝরে পূর্ব্বকথা মনে পড়ে
ঝরে যথা নদী প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময় নিমীলিত নেত্রদ্বয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন।
হারা য অর্দ্ধাঙ্গ সতী কাঁদেন কৈলাসপতি
কেবল সতীর কথা মনে,
সমস্তের জড়জীব কাঁদিছেন হেরি' শিব
কাঁদিতে লাগিল তাঁর সনে।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য গীতিকবিতার আড়ষ্ট ভাব ও ভাষার সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাই কবিচিত্ত রস ঘুরিয়া আসিলে শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার সমস্তই সহজ অনাড়ম্বর হইয়াও কেমন রসানুগ হয় এবং পূর্ব্বপরিচিত বিভাব অনুভাবই কেমন রসোদ্রেকে সমর্থ হয়।

অনুশীলনী

রসোত্তীর্ণ কাব্যের আর একটি লক্ষণ এই যে কবিচিত্তে ভাবের বাসনা দৃঢ় ও স্পষ্ট হওয়ায় কাব্যে সত্যকার অস্পষ্টতাদোষ আসে না। অনেক সময় বাসনা গভীর বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে কাব্য অস্বচ্ছ দেখাইতে পারে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এ কাব্য কোনদিন পল্বল-সলিলের ন্যায় মলিন নহে।

রসচক্রের অধিকারী কবিচিত্তও অনেক সময় রসে উঠিতে সক্ষম না হইয়া আনন্দচক্রে ভ্রমণ করে। তাহার কারণ একাধিক :—

১। প্রতিভার জোয়ার ভাঁটা আছে। ভাঁটার সময় তাহা কবিচিত্তকে ভাসাইয়া রসলোক পর্য্যন্ত তুলিতে সক্ষম হয় না।

২। প্রতিভা হয়ত স্থায়ীরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কবিচিত্ত তাহার পূর্ব্বপরিচিত রসলোকের স্মৃতিমাত্র সম্বল করিয়া নকল রসচক্রের সৃষ্টি করিতেছে, যাহা আসলে আনন্দচক্রমাত্র।

৩। প্রতিভা সবল হইলেও হয়ত অলস অর্থাৎ অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। আলস্যবশতঃ কিম্বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতায় সে তাহার সমগ্র শক্তিকে সক্রিয় করিতে পারিতেছে না। ফলে আনন্দচক্রের বেশী কিছুই সৃষ্ট হইতেছে না।

৪। দুর্ভাগ্য বা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কবিচিত্ত এমন ভাবকে রসে তুলিতে চাহিতেছে যাহা তাহার প্রতিভার শক্তিতে কুলায় না। হরিদ্বারের গঙ্গাস্রোত শিলাখণ্ড ভাসাইয়া লইতে সক্ষম, কিন্তু সুন্দরবনের ভাগীরথী বালুকণাটীকেও চড়ায় ফেলিয়া যায়। প্রতিভাও শক্তিমাত্র; ভাববিশেষের ভার যদি তাহার পক্ষে বেশী ভারী হয়, তবে তাহাকে রসলোক পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইতে সে সমর্থ হয় না এবং অল্পবীর্য্য উৎসের মত কল্পনালোকে উঠিয়াই কাব্যে ঝরিয়া পড়ে।

ভাববিশেষের গুরুত্ব-সম্পর্কে আর একটী কথা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে। রতিভাব, শোকভাব বা শমভাবকে রসে পরিণত করিতে হইলে প্রতিভার প্রকৃতি ও শক্তি যে যে পর্য্যায়ের হওয়া প্রয়োজন, হাস্যভাব, ক্রোধভাব, বিস্ময়-ভাব প্রভৃতিকে রসায়িত করিতে হইলে প্রতিভার প্রকৃতি ও শক্তি ঠিক সেই সেই পর্য্যায়ের হওয়ার প্রয়োজন নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ভিন্ন, সুতরাং তাহাদের রসে ভাসাইয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও শক্তি-বিশিষ্ট প্রতিভার প্রয়োজন হয় এবং তদুৎপন্ন রসও আস্বাদে ও গাঢ়ত্বে সকলে সমান নহে। স্বপ্রতিভার প্রকৃতি ও শক্তির সহিত ভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের হিসাব না করিয়া যদি কবিচিত্ত বিষয় নির্ব্বাচন করে, তবে

সে উদ্দিষ্ট রসে উঠিতে পারে না, অথবা পুনঃ পুনঃ রসাভাস ঘটায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিচিত্ত তাহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে—বাসনালোক হইতে। উৎকৃষ্ট কবিচিত্তের বাসনা বিচিত্র ও গভীর। এরূপ কবিচিত্তের আশৈশব ভাবস্মৃতি বাসনালোকের গভীর স্তরে অতি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই বিচিত্রগভীর বাসনা-সাগর হইতে প্রতিভা স্বীয় শক্তি অনুসারে যেরূপ উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনে, কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষের সম্ভাব্যতা প্রধানতঃ তাহার উপর নির্ভর করে।

বাসনা-লোক

যে বিশ্বপ্রকৃতি কাব্যের প্রধান ভাণ্ডার বলিয়া কথিত হয়, তাহা উপলক্ষ্য মাত্র; বাসনালোকই কাব্যের ভাণ্ডার। প্রাকৃতিক ব্যাপারের সংঘাতে কবিচিত্তে যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা কবিপ্রতিভাকে বাসনা-সাগরে ডুব দিবার প্রেরণা যোগায় মাত্র। তৎকালিক ভাবের প্রেরণায় প্রতিভা বাসনা-সাগরের তলদেশ হইতে কি রত্ন উদ্ধার করিবে তাহা অপর মানবচিত্তের অগোচর। সাধারণ দৃষ্টি হইতে কবির দৃষ্টি পৃথক্। কিন্তু এই কবিদৃষ্টি আর কিছুই নহে,—বিশেষ কবিপ্রতিভার বাসনা-সাগরে ডুব দিবার বিশেষ শক্তি। ১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড় হইল। ঝড়ের আঘাত কবি-চিত্তে ভয়বিমিশ্র বিস্ময়ভাবের উৎপাদন করিল, সকলের

মনেই তাহা অল্প-বিস্তর করে। কবিচিত্ত সাধারণ ঝড়ের বর্ণনা করিয়া ভাবসমুখ কাব্য রচনা করিতে পারিত, অথবা পূর্ব্বদৃষ্ট ঝড়ের বাসনার সহিত মিলাইয়া বাসনা-সমুখ কাব্য রচনা করিতে পারিত। বাসনা-সাগরে ডুব দিয়া কল্পনা-সাহায্যে সাধারণ কল্পনাসমুখ কাব্যরচনা করিতেও কোন বাধা ছিল না। রবিচিত্তের প্রতিভা তাহাতেও ক্ষান্ত হইতে পারে নাই; সেই ঝড়ের দিনে সে বাসনাসমুদ্রের গভীর দেশে ডুব দিয়া নিশ্চিত, নিষ্ঠুর, সহজ-দুর্দ্দম নূতনের যে মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া আনিল, ঝড়ের সহিত তাহার কোন একান্ত-নিকট সম্বন্ধই ছিল না। ইহাকেই আমরা সচরাচর কবিদৃষ্টি বলিয়া থাকি; কিন্তু ইহা দৃষ্টির কাজ নহে, বিশেষ কবিপ্রতিভার বিশেষ বাসনাসাগরে ডুব দিবার বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপার; প্রাকৃতিক ঝড় নিমিত্ত হইয়া প্রতিভাকে বাসনা-সাগরে ডুব দিবার প্রেরণা দিয়াছিল। বাসনার গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের উপর কাব্যের স্তরভেদ নির্ভর করে। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তবিশেষের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত বলিয়াই অনুভূত হউক, কাব্যের, বিশেষতঃ উচ্চ কাব্যের, ভাণ্ডার বাসনার মধ্যেই সঞ্চিত থাকে; প্রকৃতি চিরদিনই উপলক্ষ্য।

উৎকৃষ্ট কবিচিত্ত কখনও কখনও বাসনার এমন গভীর

স্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করে যাহার ভাব এ জীবনের অর্জ্জিত বলিয়াই মনে হয় না। তাহা যেন পূর্ব্বজন্মের, জন্ম-জন্মান্তরের আস্বাদিত ভাবের বাসনা। কবি তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় এইরূপ জীবনান্তরে আস্বাদিত ভাবের বাসনাকে কল্পনা-সাহায্যে অপরূপ রসমূর্ত্তি দিতে সক্ষম হন। কালিদাস বলিয়াছেন, ‘মেঘ দেখিলে সুখী ব্যক্তিদের চিত্তও এক প্রকার ব্যথায় ভরিয়া উঠে, তাহার কারণ জন্মান্তরের স্মৃতি।’ আর এক কবিচিত্ত যেখানে বলিতেছে—

গভীর চিত্তে গোপনশালা, সেথা ঘুমায় যে রাজবালা।
জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া।

অথবা

আজ জেগেছে যে সব ব্যথা,
এই জীবনে নেইকো তাহার হেতু।

সেখানেও সেই গভীর বাসনা-স্তরের কথাই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে। জন্মান্তর যাঁহারা না মানেন, তাঁহাদেরও heredity, উত্তরাধিকার, মানিতে হয়। মানব-মনের সমস্ত বাসনা একটী খণ্ডিত জীবনে অর্জ্জিত ভাবস্মৃতি মাত্র না হইতে পারে। জন্মান্তরে বা যুগযুগান্ত-প্রবাহী মানব-বংশের অতীত ধারায় যে যে ভাবের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের অজ্ঞাতসারে বাসনায় পরিণত

হইয়া আছে। সাধারণতঃ তাহারা নিষ্ক্রিয় বা তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে।
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

ইহা বাসনালোকের সেই স্তরের কথা যেখানে 'বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত' হইয়া আছে।

সুতরাং বাসনাকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—অর্জ্জিত ও লব্ধ। কবিচিত্ত বিশিষ্ট প্রতিভার বলে এই গভীর লব্ধবাসনার স্তর হইতেও কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া কল্পনালোকে রসের পাক চড়ায়। যে-সব ভাবের সহিত পরিচয় জীবনে হইয়াছে, যে-সব বাসনা অর্জ্জিত, তাহাদের রসে উঠানই কঠিন; আবার যাহাদের সহিত এ জীবনে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, সেই সব লব্ধবাসনাকে রসমূর্ত্তি দেওয়া নিশ্চয়ই কঠিনতর। কিন্তু কবিচিত্তে এই লব্ধ-বাসনা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতীতি থাকে বলিয়াই তাহাকে রসান্বিত

করা সম্ভব হয়। উত্তুঙ্গপ্রতিভা-মণ্ডিত কবিচিত্তের অতল-স্পর্শ বাসনা-সাগর হইতে যে রসমূর্ত্তি উঠিয়া আসে, তাহা রসিক চিত্তেরও বিস্ময়ের কারণ হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা এমনি একটি রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে – তাহার নাম জীবনদেবতা। কবিপ্রতিভা তাহার গভীর লব্ধ-বাসনার স্তর হইতে শুক্তি তুলিয়া সেই জীবন-দেবতাকে মুক্তামালায় সাজাইতে আজিও একেবারে ক্ষান্ত হইতে পারে নাই।

বলা বাহুল্য এই কবিচিত্তের পূর্ণ পরিচয় সেই পাঠক-চিত্তেই সম্ভব যাহা বাসনালোকের গভীর স্তরসম্বন্ধে সজাগ, এবং যেখানে অনুরূপ লব্ধবাসনা সঞ্চিত আছে।

কিন্তু কবিচিত্ত কখনও কখনও লব্ধবাসনার এমন স্তর হইতে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করে যাহা কখনও ভাবরূপে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই মনে হয় না, সুতরাং যাহার সম্বন্ধে কোন বাসনার অস্তিত্বেই সন্দেহ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। কবি যখন বলেন—

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী,

দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার

পরশ পাবার প্রয়াসী,
আমি সুদূরের পিয়াসী।

তখন সীমাবদ্ধ মানব-মনের এই যে অসীমের জন্য ব্যাকুল পিপাসা, ইহার বাসনা কোথায়? ইহার ভাব এ জীবনে অর্জ্জিত হয় নাই নিশ্চয়। জন্মান্তরে বা মানবেতিহাসের অতীত ধারায় চিত্ত যে-যে ভাবের সহিত সম্ভবতঃ পরিচয় স্থাপন করিয়া আসিয়াছে, এ তৃষ্ণার মূলে ত তাহাদের কোনটার বাসনা বর্ত্তমান দেখা যায় না। ইহার মূল ত অতীতে যাহা পাইয়াছি তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মনে হয় না, বর্ত্তমানে যাহা পাই নাই, ভবিষ্যতে যাহা পাইতে চাই তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক। এই যে

অসীম চাহিছে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা।

ইহার ভাবস্মৃতি কোথায়?

লব্ধবাসনার অতলস্পর্শতার মধ্যে ডুবিয়া চলিলে আমরা অনুভব করিতে পারিব যে এ আকাঙ্ক্ষা যাহাকে কখনো পাই নাই ঠিক তাহার জন্য নহে; জীবচৈতন্যোদয়ের অতিপ্রত্যুষে যে অসীম চৈতন্যসাগর হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম, তাহাকেই পুনরায় পাইবার জন্য এই আকাঙ্ক্ষা। অসীমের সাগরে যেদিন প্রথম ঘট ভরা হইল, সেইদিন উভয় জলে ঘটের যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ভাব বাসনা]

আকারে ঘটের জলে সঞ্চিত আছে, হয়ত-বা সাগরের জলেও ঘুমাইয়া আছে। সে ঘটের জল যেখানে রাখ, যেখানে ফেল, যেখানে উঠাও, তাহা অনিবার নিম্নাভিমুখে সাগরেই মিশিতে চাহিতেছে। বাষ্প করিয়া আকাশে উড়াও—মেঘ হইয়া নিম্নে বর্ষিত হইবে; তুষার করিয়া পর্ব্বতে উঠাও—নির্ঝর হইয়া নামিয়া আসিবে; মাটী খুঁড়িয়া পুকুরে ভর—তলে তলে নদীর সন্ধান করিয়া সাগরের উদ্দেশে ছুটিবে। উত্তুঙ্গ হিমাদ্রির চিরহিমরেখার উর্দ্ধে জমাইয়া রাখিলেও সে সাগরের ধ্যানে মগ্ন থাকিবে, যুগযুগান্তে সুযোগ পাইলেই তুষারনদীরূপে সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাগরের পানে প্রবাহিত হইবে। অসীম সাগরকে পাইবার জন্য ঘটের জলের যে তৃষ্ণা, তাহা অপ্রাপ্তকে পাইবার তৃষ্ণা নহে, অতিদূর অতীতে যাহা হারাইয়াছি, ইহা তাহারই বেদনা। আমরা অসীমের কথা কহিতেছি, যেখানে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অন্তরাল লুপ্ত হয়; সুতরাং হারানোর বেদনা ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এখানে হয়ত একই জিনিষের ভিন্ন প্রকাশ মাত্র, একই বৃত্তাভাসের দুই কেন্দ্র। তথাপি একথা অনুভব করা কঠিন নহে, যে সীমাবদ্ধের চিত্তে অসীমের জন্য এই যে ব্যাকুলতা ইহা লৌকিক বিরহ না হইলেও অসীম অতীতের মধ্যে আদি-মিলনের ভাবস্মৃতি হইতে উদ্ভূত বিরহ। বর্ত্তমানে তাহা

আমাদের অনধিগম্য হইলেও অতীতে তাহার সহিত পরিচয়ের অভাব ছিল না। কোন পরিচয়ই যদি না থাকিবে তবে কবিচিত্ত কেন পরক্ষণেই বলে—

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত?
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী,
হে সুদূর আমি প্রবাসী।

ঘটের জলকে ভাঁড়ার-ঘরের জলচৌকির প্রবাসে রাখা হইয়াছে, কলকলোত্থ স্বভাষা সে ভুলিয়াছে, কিন্তু এখনও একেবারে ভুলিতে পারে নাই—অতিপ্রত্যুষে নদীজলধারায় সে বহিয়া চলিয়াছিল, সহসা কে যেন ঘটের আঘাতে ঢেউ তুলিয়া তাহাকে সেই নদীধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া আনিল। নির্জ্জন পল্লীপথে গমনান্দোলিত সুন্দরীর কক্ষে ভুজলতাবেষ্টনলব্ধ আনন্দে সে মুখরিত হইয়াছে; গৃহস্থের গৃহে আসিয়া নির্ম্মলা-কর্পূর সহযোগে সে স্বাদগন্ধ অর্জ্জন করিয়াছে; কিন্তু ঘটের ঘায়ে যে ঢেউ উঠিয়াছিল সেই ঢেউ-এর কথা ত সে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। পল্লীর গৃহস্থ-বধূরা আজিও জানে—ঢেউ দিয়া জল ভরিলে মৃৎকলসের

মিষ্টিক্ কবিতা

নিস্তরঙ্গ নিথর বদ্ধ জলও ভাঁড়ার-ঘরে বসিয়াই হঠাৎ কখন কলস ভাঙিয়া গড়াইয়া চলিবে। নদীতীরপল্লীর প্রতি গৃহস্থবধূ জল ভরিবার সময় বিশেষ সাবধান হয় যেন জলের সহিত ঢেউ না আসে, কারণ সে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ করিয়াছে কুম্ভের জলে ঢেউ-এর স্মৃতি থাকিয়াই যায়; বদ্ধ ঘরের নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকাবে ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিবার আকাঙ্ক্ষা যদি কুম্ভের জলে জাগিয়া উঠে, বুঝিতে হইবে প্রত্যূষে ঢেউ দিয়া জল ভরা হইয়াছিল। ঢেউ-এর মধ্য দিয়া নদীধারার সহিত যে বিচ্ছেদ কুম্ভজলের ঘটিয়াছে, তাহারই ভাবস্মৃতি বা বাসনা লব্ধবাসনার যে অতি-গভীর স্তরে ঘুমাইয়া থাকে তাহাকে 'অতিলব্ধবাসনা' বলা যাইতে পারে। যে কবিপ্রতিভা এই অতিলব্ধবাসনার অতলতা হইতে ঢেউ-এর গান তুলিতে সক্ষম হয় তাহাকে আমরা mystic কবিপ্রতিভা বলি। সে প্রতিভা ঘটের জলকে জানায়—

নাহি জানে কেউ—
রক্তে তোর নাচে আজি
সমুদ্রের ঢেউ।

অপূর্ব্ব অনুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে সে ঘটের জলকে লোভ দেখায়—

ওরে দ্যাখ্, সেই স্রোত হ'য়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে' থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহাস্রোতে,
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে।

এই mysticism যদি ভাবমূলক না হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অভাবাত্মক হইত, অর্থাৎ যাহাকে কখনো পাই নাই তাহাকে পাইবার ব্যাকুলতাই যদি ইহার একমাত্র উত্তেজক কারণ হইত, তবে mystic কাব্যে অসীমের সহিত লীলার প্রকাশ দেখিতে পাইতাম না। এ লীলায় মিলনের ভাবস্মৃতি আছে বলিয়া বিরহ গভীর ও মধুর হইয়াছে। 'বাসকশয়ন 'পরে' সীমা যখন অসীমের বাহুতে বাঁধা ছিল তখন 'ঘুম-ঘোরে অচেতন' থাকিলেও তাহার বাসনা আজও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কারণ সে অন্য মুহূর্ত্তে বলিতেছে,—

তোমায় জানিনা চিনিনা একথা বলত
কেমনে বলি?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও চলি।

অসীম যখন সীমার দুয়ারে আসিয়া,
শুধালো কাতরে সে কোথায় সে কোথায়
ব্যগ্র চরণে আমারি দুয়ারে নামি'
সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
নবীন পথিক সে যে আমি
সেই আমি।

এই সরমের কল্পনা মিলনভাবের অতিলব্ধবাসনা-সঞ্জাত, ইহা অভাবাত্মক বিরহ মাত্র নহে।

কাহার ঘট মহাসাগরের কোন্ সমুদ্রে ভরা হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? প্রশান্ত সমুদ্রে না অতলান্তিকে, লোহিত সাগরে না পীত সমুদ্রে? কাহার ঘট কোন্ সময়ে ভরা হইয়াছিল তাহাই বা কে জানে? বিক্ষুব্ধ বাত্যায় না প্রশান্ত চন্দ্রকিরণে? সুতরাং চিত্তে চিত্তে অতিলব্ধবাসনা বিভিন্ন হইবার পক্ষে বাধা দেখা যায় না এবং mysticismও ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

Mystic কবিতার চক্র সম্পূর্ণ করিতে mystic পাঠক-চিত্তের প্রয়োজন; অর্থাৎ যে পাঠকচিত্তে সেই ঢেউ-এর ভাবস্মৃতি একেবারে ঘুমাইয়া পড়ে নাই এবং অনুরূপ ঢেউ-এর দোলা যে চিত্তকে আজিও মধ্যে মধ্যে নাড়া দেয়, সেই পাঠকচিত্ত সহধর্ম্মী mystic কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

খাঁটি mystic ও নকল mystic কবিচিত্তের প্রধান প্রভেদ এই যে নকল mystic কবিচিত্তে অতিলব্ধবাসনা সম্বন্ধে প্রতীতি বা প্রকৃত অনুভূতি নাই, তাহা তাহার শোনা কথা মাত্র।

বাসনালোকে দাঁড়াইয়া আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারে—কাব্যে তত্ত্বের স্থান আছে কিনা? কিন্তু এ প্রশ্নই সঙ্গত মনে হয় না। কাব্যে সকল বস্তু ও বিষয়েরই স্থান আছে, এবং তত্ত্বেরও আছে, প্রতিভা যদি তাহাকে বাসনা হইতে কল্পনার মধ্য দিয়া রসে পৌঁছাইতে পারে। এক এক শ্রেণীর সাধারণ ভাবই চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে বাসনাস্তরে উঠিয়া দানা বাঁধিয়া যে বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাহাই সে চিত্তে উক্ত ভাবের তত্ত্ব। তত্ত্বীভূত বাসনা বিশিষ্ট কল্পনা দ্বারা জারিত হইলে রসলোকে উঠিতে পারে; আবার সুচিন্তিত যুক্তি দ্বারা চালিত হইলে দর্শনক্ষেত্রে স্থান পায়;—সে দোষ বা গুণ তত্ত্বের নহে, তাহা চিত্তের। বরং ইহাই সম্ভব যে ভাব-বিশেষের বাসনা চিন্তাশীল কবিচিত্তে দৃঢ় হইলে দানা বাঁধিয়া প্রথমে এক একটী তত্ত্বরূপই গ্রহণ করে এবং সেই তত্ত্ব উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার নিকট রসে উঠিবার যোগ্যতর ও উচ্চতর উপাদান হইয়া উঠে। কর্দ্দমসাহায্যে ঘরের দেওয়াল দেওয়ায় বাধা নাই, কিন্তু কর্দ্দম হইতে ইষ্টক প্রস্তুত

তত্ত্ব

করিয়া তৎসাহায্যে দেওয়াল দেওয়া অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রথাই মনে হয়। ইষ্টক ত আর কিছু নহে, সে এক-প্রকারের মৃৎতত্ত্ব মাত্র। রবীন্দ্র-কাব্যে অনেক ভাবই প্রায় তত্ত্বরূপ গ্রহণ করিয়া পরে রসে উঠিয়াছে। তাঁহার রসোত্তীর্ণ কবিতাসমষ্টি হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে জীবন সম্বন্ধে তাঁহার একটী তত্ত্ব আছে, মরণ সম্বন্ধে তাঁহার একটী তত্ত্ব আছে, এমন কি বর্ষা সম্বন্ধে, গ্রীষ্ম সম্বন্ধে, সন্ধ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার এক একটী তত্ত্ব আছে। আর সেই-জন্যই তাঁহার অসংখ্য ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যেও ঐ ঐ বিষয় এক একটী বিভিন্ন অথচ সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সৃষ্টির মধ্যেও অনেক চরিত্র আছে যাহারা এক একটী তত্ত্ব মাত্র। রসে উঠিবার পথে তত্ত্ব অবশ্য-প্রয়োজনীয় না হইলেও তাহা ঐ পথের অন্তরায় নহে। কেবল অল্পশক্তি কবিপ্রতিভা তত্ত্বের ভার সম্যক্ বহন করিতে পারে না বলিয়া কাব্য রসবিমুখী ও দর্শনমুখী হইয়া পড়ে।

রসোত্তীর্ণ কাব্য বাহিয়া রসলোকে কবিচিত্তের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারিলেই রসোন্মুখী অর্থাৎ সুরসিক পাঠকচিত্তের কাজ শেষ হইল। কিন্তু এই সুরসিক পাঠক-চিত্তের মধ্যে যাহারা রসাস্বাদের পর রসলোকে বিশ্রাম

না করিয়া কবিচিত্তধারার প্রতিকূলে তাহার প্রতিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস পায়, এবং কবিচিত্তের কল্পনালোক, বাসনালোক ও ভাবলোকের সম্যক পরিচয় পাইবার জন্য রসচক্র সম্পূর্ণ পরিবেষ্টন করিয়া একেবারে স্বক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে, তাহাকে ক্রিটিক্‌চিত্ত বলা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট কবিচিত্ত যেমন রসে পৌঁছিয়াও স্থির থাকে না, কাব্যে নামিয়া তবে শান্তিলাভ করে, ক্রিটিকচিত্ত তেমনি রসলোকে পৌঁছিয়াই পূর্ণ তৃপ্তি পায় না, কবিচিত্তধারার প্রতিবর্ত্তন করিয়া নূতন আনন্দলাভের চেষ্টা করে। কবিচিত্তধারার সম্যক্ পরিচয় লাভ করাই ক্রিটিক্‌চিত্তের ধর্ম্ম।

ক্রিটিক্‌চিত্ত

কবিও পাঠক, সুতরাং কবির মধ্যে কবিচিত্তধারার পাশে পাশে পাঠকচিত্তধারাও বর্ত্তমান। কোন কবির কবিচিত্ত সাধারণতঃ ভাবসমুখ, বাসনাসমুখ কিম্বা কল্পনাসমুখ হইলেও তাহার অভ্যন্তরস্থ পাঠকচিত্তের রসোন্মুখী হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। বরং ইহাই দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিরা প্রায় সকলেই রসোন্মুখী। তাঁহাদের অভ্যন্তরস্থ পাঠকচিত্তের এই রসোন্মুখীনতাই অনেক সময় তাঁহাদের কবিচিত্তের প্রেরণা যোগায়। প্রতিভার অল্পতায় কবিচিত্ত বিলাসচক্রে বা আনন্দচক্রে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের পাঠকচিত্ত চিরদিনই রসচক্রের

অধিকারী। উচ্চ কবিপ্রতিভা একান্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু রসোন্মুখীচিত্ততাও জগতে সুলভ নহে। যে পথে হউক রসলোকে উঠিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই ধন্য।

আয়াস সহকারে অথবা অনায়াসে যে সমস্ত কাব্যের অর্থবোধ হয়, তৎসম্পর্কিত কবিচিত্ত ও পাঠকচিত্তের অনুসরণ এতক্ষণ করিলাম। কিন্তু এমন কাব্যও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাহার কবিচিত্তকে উন্মাদ কবিচিত্ত বলা যাইতে পারে। সে পূর্ণ-নিরঙ্কুশ কবিচিত্তের গতিপথ কোন নিয়মের ধার ধারে না বলিয়া সুস্থচিত্তে তাহার অনুসরণ অসাধ্য। সে কাব্যের সম্যক্ অর্থ করা সম্ভব হয় না, কারণ তাহা প্রলাপ-প্রধান। অথচ এই প্রলাপচক্র সম্পূর্ণ করিতে পারে এমন পাঠকচিত্তও এই বিচিত্র জগতে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সে 'মদসমুত্থ' কাব্যের বিষয় আমাদের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

কাব্য-পরিমিতি লিখিয়া যে অপরাধের ভাগী হইলাম তাহার উল্লেখ করিয়া ইহার উপসংহার করি। প্রথম অপরাধ—রসচক্রের রেখারূপ অঙ্কনের প্রয়াস। সমস্ত অপরাধের মূলে মানবচিত্তের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান। অনুভব-যোগ্য রসকে 'বুঝিবার' চেষ্টার ফলেই এই রসচক্রের উদ্ভব। কিন্তু অবোধ্যকে বুঝিবার চেষ্টা মানবমনের চিরন্তন

দুর্ব্বলতা। তথাপি রসজ্ঞদের নিকট আমি আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

দ্বিতীয় অপরাধ আমার অন্তরঙ্গ কয়েকটী বন্ধুকবিদের সম্পর্কে। পাঠকচিত্তধারার অনুসরণ সম্বন্ধে যাহাই বলি, কবিচিত্তধারার অনুসরণ আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইত না, যদি কয়েকটী সহৃদয় কবিচিত্তের সহিত আমার অন্তরঙ্গতা না থাকিত। রসের আলোচনাসম্পর্কে তাঁহারা নিজ নিজ চিত্তের দ্বার আমার নিকট পুনঃপুনঃ অকপটে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি বিচিত্র-সুন্দর কবি-চিত্তধারার যা-কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারিয়াছি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আমার বক্তব্য বিষয়ে প্রতীতি সেই বন্ধু কবিদের সংস্পর্শেই আসিয়াছে। আমার অনেক কথাই রসতত্ত্বালোচনা-কালে তাঁহাদের রসমুগ্ধ অন্তরের কথা। বলিয়া-ও না-বলিয়া সংগৃহীত তাঁহাদের সেই সব অন্তরের কথা কম্পাসে চিত্রিত করিয়া সাধারণের গোচর করিবার অপরাধ আমার হইয়াছে—সেজন্য আমি আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু-কবিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।